ত্রৈমাসিক

বর্ষ : ৫ । সংখ্যা : ১৭ । জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ১৭

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর পক্ষে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯

যোগাযোগ : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
৫৫/বি পুরানা পল্টন,
নোয়াখালী টাওয়ার, সুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৬০৫২৭
মোবাইল : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, ০১৭১১ ৩৪৫০৪২
০১৯১৭-১৯১৩৯৩, ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৫	
ইসলামের আলোকে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য	৯	এহসান যুবাইর
যেনা -ব্যভিচার সম্পর্কে ইয়াহূদী-খৃস্ট ধর্মের বিধান ঃ একটি পর্যালোচনা	২৫	মুহাম্মদ মূসা
ইমাম গাজালীর অর্থনৈতিক দর্শন	৩৩	ড. শওকী আহমদ দুনয়া
ফিক্‌হের মূলনীতি ও ব্যাপক নিয়ম	৩৭	মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী
ওয়াক্‌ফ বিধান	৫৫	মাওলানা ফারুক আহমদ
ওয়াকফ, জনকল্যাণ এবং কিছু প্রস্তাব	৬৯	মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা
ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান	৭৭	মোঃ নূরুল আমিন
মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ	৮৩	ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান
মাদকাসক্তি ঃ প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইন	১০৩	তারেক মুহাম্মদ জায়েদ

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭

সম্পাদকীয়

ইসলাম একটি অবিভাজ্য অলংঘনীয় বিধি বিধানের সমষ্টি

আমরা মুসলমান। দুনিয়ার একটা বিশাল জনগোষ্ঠী। সারা দুনিয়ার জনসংখ্যার চার ভাগের একভাগ। এশিয়া ও আফ্রিকা দুটি মহাদেশের বৃহত্তম এলাকা জুড়ে আমাদের মূল অবস্থান। এছাড়াও সারা দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি আমরা। ইসলাম আমাদের ধর্ম বলে আমরা গর্ব অনুভব করি। দুঃখের বিষয়, যে ইসলাম নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি তার হুকুম আহকাম, আদেশ নিষেধ ও বিধি বিধান সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা পাহাড় সমান। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহও কম। আমরা অধিকাংশই নিছক গতানুগতিক মুসলমান। যুগ প্রবর্তিত ধারায় জীবন নির্বাহ করতে অভ্যস্ত।

অথচ আমরা কোনো বংশানুক্রমিক নয় বরং একটা আদর্শিক জাতি। আল্লাহ, রসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা মুসলমান এবং এ বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়লে আমদের মুসলমানিত্বও দুর্বল হয়ে পড়ে, একথা আমাদের কম লোকই জানে। ইসলাম একটা আদর্শ ও মতবাদ এবং এ আদর্শ ও মতবাদের ভিত্তিতে কিছু রীতিনীতি ও বিধি বিধান রচিত হয়েছে। এসব মতাদর্শ ও বিধি বিধান আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ থেকে প্রমাণিত। আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন এবং নিজে এরি ভিত্তিতে জীবন গঠন করেছেন। এগুলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করেছেন। মূলত কুরআন ও রসূল উপস্থাপিত এই মতাদর্শ ও বিধি বিধানকে আমরা একত্রে ইসলামী শরীয়ত বলে থাকি। ঈমান তথা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস যাকে আমরা তওহীদ বলে থাকি, ইবাদত বন্দেগী, ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, সব ধরনের পারস্পরিক লেনদেন, সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সমিতি, রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলাম যেসব কর্মনীতি উপস্থাপন করেছে এসবের সমষ্টির নামই ইসলামী শরীয়ত। এই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কাজ করাই একজন মুসলমানের জীবন।

ইসলামকে দুনিয়ায় কেন পাঠানো হয়েছে? একজন মুসলমান ইসলামকে জানবে, তার হুকুম আহকাম ও আদেশ নিষেধ মেনে চলবে, তার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে এবং সমস্ত কাজ কর্ম ও অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করবে, মোটকথা ইসলামকে জীবনের পরিচালক শক্তি হিসাবে নিযুক্ত করবে, এছাড়া অন্য কোনো কারণে ইসলামকে দুনিয়ায়

পাঠানো এবং আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন করা হয়নি। কাজেই ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়িত না করলে এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন না করলে ইসলামকে পরিত্যাগ করাই হয়। আর ইসলামকে পরিত্যাগ করে কেউ মুসলমান থাকতে পারেনা।

ইসলামের সমস্ত হুকুম আহকাম ও বিধিবিধান দুটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশে আছে ঈমান, আকিদা বিশ্বাস, ইবাদত বন্দেগী, তাকওয়া, ইহসান ইত্যাদি ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিধান যেগুলোকে আমাদের ভাষায় আমরা বলতে পারি ধর্মীয় বিধান। অন্য অংশে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তিদের এবং বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক রীতিনীতি, আইন ও বিধি বিধান উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পারস্পরিক লেনদেন, বিচার, শাস্তি, প্রশাসন, দুনিয়ার জীবন সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারাদি, শাসনতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের উপস্থাপিত বিধি বিধান কুরআন মজীদে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম যেমন প্রচলিত ভাষায় একটি ধর্ম তেমনি একটি বৈষয়িক জীবন বিধানও। একদিকে মসজিদ ও ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগী এবং অন্যদিকে সমাজ, রাজনীতি ও বান্দার সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় বিধান এবং বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক লেনদেন ও যাবতীয় বৈষয়িক বিধান। এককথায় দীন ও দুনিয়ার সম্মিলিত নাম ইসলাম। ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম, ইবাদত বন্দেগী ও বৈষয়িক লেনদেনের মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখা অংকিত নেই। মুসলমানের ধর্ম যেমন ইসলামের অংশ তেমনি তার রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থাও ইসলামের একটি অপরিহার্য অংশ এবং দুয়ের সম্মিলিত নাম ইসলাম।

ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাত এবং ইহকাল ও পরকালকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে সুন্দর, সৌভাগ্যপূর্ণ ও সফল করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনের প্রতি পদে পদে মুসলমানকে আখেরাতের জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি বৈষয়িক কাজেরই একটি পরকালীন পরিণতি ও ফলাফল রয়েছে। মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, প্রশাসনিক, শাসনতান্ত্রিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিটি কাজেরই দুনিয়ার বৈষয়িক জীবনে একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সেক্ষেত্রে সে কোনো কর্তব্য পালন করে, কোনো সমস্যার সমাধান করে অথবা সমস্যা সৃষ্টি করে, কোনো সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে অথবা তার বিলোপ সাধন করে কোনো অপরাধের বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান বা তাকে রেহাই দেয় অথবা কোনো কাজের জবাবদিহির ব্যবস্থা করে। মোট কথা যাই কিছু করা হোকনা কেন এসব কাজের যেমন বৈষয়িক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে তেমনিভাবে তার একটি পরকালীন পরিণতিও অনিবার্য। দুনিয়া স্বল্পকালীন এবং পরকাল অনন্তকালীন। কাজেই পরকালীন পরিণতি তথা সওয়াব বা আযাব এবং জান্নাত বা জাহান্নাম অনন্ত কালীন।

ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এই ভাবধারা জাগ্রত করে। ইসলামী শরীয়তের চরম লক্ষ দুনিয়ায় ও আখেরাতে এবং ইহকালে ও পরকালে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ

হিসাবে ইসলাম একটি অবিভাজ্য শরীয়ত ব্যবস্থা এবং অবিভাজ্য আইন ও বিধি বিধানের সমষ্টি। তার একটি অংশকে আর একটি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তার একটি গ্রহণ ও অন্যটি বর্জন করা যায়না। এটা ইসলামী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই ইসলামী ব্যবস্থা ও বিধি বিধানের একটিকে গ্রহণ করা এবং অন্যটিকে বর্জন করা ইসলামী ব্যবস্থা ও বিধিবিধানকে ব্যর্থ করে দেয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে মুসলমানের জীবন ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে যায়। তার ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগী যেমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তেমনি তার বৈষয়িক জীবনেও নেমে আসে ব্যর্থতা। যেমন মুসলমানের ইবাদত বন্দেগী গ্রহণীয় হবার জন্য তার হালাল রুজির কথা বলা হয়েছে। আর হালাল রুজি সম্পূর্ণ একটি বৈষয়িক ব্যাপার। এথেকে প্রমাণ হয় মুসলমানের ইবাদত বন্দেগী ও বৈষয়িক জীবন একসূত্রে গাঁথা। এর একটিকে আর একটি থেকে আলাদা করা যায়না।

কুরআন অধ্যয়ন করলে একথার সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে যায়। কুরআনের প্রত্যেকটি বিধান এমন যে তা মেনে না নিলে বা তার বিরুদ্ধাচরণ করলে দুটি পরিণতি অবশ্যই হবেঃ একটি ইহকালীন এবং অন্যটি পরকালীন। যেমন কোনো ব্যক্তি ডাকাতি করলে সে মৃত্যুদণ্ড অথবা দেশ থেকে বহিষ্কারের শাস্তি পেতে পারে। এ দুটি হচ্ছে বৈষয়িক শাস্তি। তার দুনিয়ার জীবনে এ শাস্তি লাভ করবে। আর তার আর একটি শাস্তি রয়েছে পরকালীন জীবনে। সেখানে তাকে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা অথবা শূলীবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।' (আল মায়েদা ঃ ৩৩)

অশ্লীলতা, চারিত্রিক নৈরাজ্য ও যৌন ব্যভিচারের প্রচলন করা এবং নির্দোষ, পবিত্র ও নিষ্কলংক মহিলাদেরকে মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করা একটা মস্তবড় অপরাধ। এজন্য একই সাথে দুটি শাস্তি রয়েছে। একটি কার্যকর হবে এ দুনিয়ায় এবং অন্যটি আখেরাতে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়ায়ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি...।' (আননূর ঃ ১৯)

আরো বলা হয়েছে ঃ

যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়ায়ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং সে দিন তাদের দেয়া হবে কঠিন আযাব যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিয়ে দেবেন এবং তারা জানবে আল্লাহ সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।' (আন নূর ঃ ২৩, ২৪, ২৫)

ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যার শাস্তি দুটি। একটি কিসাস। এটি দুনিয়ার শাস্তি। আর অন্যটি পরকালীন জাহান্নামের আযাব। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

'হে মুমিনগণ, নরহত্যার অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তোমাদের জন্য কিসাসের (হত্যার বদলে হত্যা) বিধান দেয়া হয়েছে। (আল-বাকারা ঃ ১৭৮)

আরো বলা হয়েছে ঃ

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম- সেখানে তাকে থাকতে হবে চিরকাল।' (আন নিসা ঃ ৯৩)

এভাবে ইসলামী শরীয়তের এমন কোনো বিধান পাওয়া যাবেনা যেখানে একই সংগে ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির বিধান দেয়া হয়নি। তবে ইহকালীন যথাযথ শাস্তির পর যদি সে খালেস দিলে আল্লাহর কাছে তওবা করে তাহলে আল্লাহ চাইলে তার তওবা কবুল করে তাকে পরকালীন শাস্তির হাত থেকে নিস্কৃতি দিতে পারেন।

তবে একথা মনে রাখা দরকার ইসলামী শরীয়তের বিধি বিধানের ইহকালীন ও পরকালীন পরিপ্রেক্ষিত মোটেই কোনো অস্বাভাবিক ও অর্থহীন বিষয় নয়। এটা একটা যথার্থ ও বাস্তব সত্য এবং বিশ্বপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি। ইসলাম দুনিয়ার এই ইহকালীন পরিবেশকে পরকালের ক্ষেতখামার এবং পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত করে। দুনিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হবে এবং এর প্রতিফল উদ্ভাসিত হবে আখেরাতে। আখেরাত চিরন্তন, তার ক্ষয় নেই।

মানুষ তার কাজের জন্য দুনিয়ায় একটি দায়িত্বশীল জীব। কারণ তার প্রত্যেকটি কাজের একটি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে। এবং তাকে অবশ্যই এর প্রতিফল পেতে হবে। এ দুনিয়ায় না পেলে অন্য কোথাও পেতে হবে। অথবা এ দুনিয়ায় যথাযথ না পেলে অন্য কোথাও পুরোপুরি পেতে হবে। তবে কোনো দায়িত্বশীল মানুষ যদি এ দুনিয়াটাকে মিথ্যা ও অন্যায়ের কারবার বলে মনে করে থাকে তাহলে তার দায়িত্বশীলতাই প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। তাই ইসলাম দায়িত্বশীলতার সাথে ইহকালকে পরকালের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। ইহকালে জীবনের যতিরেখা না টেনে পরকালে তাকে অনন্ত করেছে। এবং ইহকালের সমস্ত কাজের প্রতিফলন পরকালে উদ্ভাসিত করেছে। ফলে ইসলামে ইবাদত বন্দেগী ও বৈষয়িক বিষয়াবলীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো অবকাশ নেই। উভয়ে ইহকালে যেমন একত্রে গ্রথিত এবং একটির সাথে অপরটি সম্পর্কযুক্ত তেমন পরকালেও তাদের অভিন্ন প্রকাশ ঘটবে এবং তাদের অবস্থান হবে অভিন্ন।

- আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ঃ ৯-২৪

ইসলামের আলোকে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য

এহসান যুবাইর

ভূমিকা

সম্প্রতি বিমানবন্দর গোলচত্বরে বাউল ভাস্কর্য স্থাপন ও অপসারণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। আলেম সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণ হজ্জ ক্যাম্প হতে বিমানবন্দরে যাওয়ার মুখে মূর্তি স্থাপনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। 'ইসলামে প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ নিষিদ্ধ' এটি একটি সর্ববাদীসম্মত মত হওয়া সত্ত্বেও এ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু করা হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতা প্রমাণের জন্য বিমানবন্দরে বাউল ভাস্কর্য অপসারণ ঘটনা নিয়ে অপতর্ক শুরু করেন কতিপয় নামধারী আলেম, আর জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী। প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত একটি কেদারা শো'র কার্যবিবরণী আমার হাতে রয়েছে: যেখানে কতিপয় ভন্ড, ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের সংরক্ষক মুহাদ্দিস ও ফিক্‌হবিদগণের ব্যাপারে বিষোদ্গার করেন। স্বার্থবাদী, ভোগবাদী ও পেটপূজকদের এহেন আক্রোশের কারণ অবশ্য পরিষ্কার; ঐ মহামনীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে আমরা ইসলামী আইনের সৌধ অবিকৃত অবস্থায় পেয়েছি। তাঁরা যদি অমানুষিক পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী উৎস-ভাণ্ডার আমাদের জন্য সংরক্ষণ না করতেন, তবে প্রবৃত্তি-পূজারীরা অবাধে ভোগ-বিলাস ও অপকর্মে মত্ত হতে পারতো। অতএব আলেম নামধারী ভণ্ড ও প্রতারকরা মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ঐ সেমিনারে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ভাস্কর্য তথা মূর্তির বৈধতার সপক্ষে কিছু অভিনব ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কতিপয় ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লেখ করেন যাতে চিত্র ও ভাস্কর্যের বিষয়ে রসূল স.-এর উদার মনোভঙ্গি ছিল বলে দাবী করা হয়। যেমন রসূলুল্লাহ স. নাকি কা'বাঘরে ঈসা ও মারয়াম আ.-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন। এ রচনায়, আরো পরে আমরা এ যুক্তিগুলোর অসারতা প্রমাণ করব। এদেশের নামধারী মুসলিম অধ্যাপকেরা আরবী ও ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নতুন কিছু আবিস্কার করেছেন এমন ভাববার কোন কারণ নেই; তারা বরং তাদের

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশ্চাত্য গুরুদের সক্লেশ উদ্ভাবিত কিছু তথ্য উপস্থাপন করে চমক দিতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আমি নিসংশয় যে, বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম সমাজ জানেন এবং মানেন যে ইসলামে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ নিষিদ্ধ। কাজেই ভণ্ড ও নামধারী বুদ্ধিজীবীদের শতশত কেদারা শোর'র কোন প্রভাব ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণের ওপর পড়বে না। তবুও এ বিষয়ে আমি কলম ধরেছি দুটো কারণে; প্রথমত: ইসলামের ইতিহাসের কিছু মৌলিক সূত্রের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে, যে গ্রন্থগুলো সাধারণত গ্রহণযোগ্য। এসব গ্রন্থে আসলেই ছবি/ভাস্কর্যের অনুমোদনের ন্যায় বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কেরামের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, না এটি একটি বিকৃত তথ্য? এটা অবশ্য যাচাই করতে হবে। দ্বিতীয়ত মুসলিম তরুণদের বড় একটি দল যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দেওয়ার পর গ্রাম থেকে শিখে আসা শেকড়ের জ্ঞান ও আচার ভুলতে থাকে, তারা এই অধ্যাপকদের একদেশদর্শী বক্তব্যে বিভ্রান্ত হতে পারে। তাই আমি মনে করেছি এ ব্যাপারে কলম ধরা উচিত।

প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণে ইসলামী বিধান বিষয়ে আমার ধারণা স্বচ্ছ হলেও আমি তা কারো ওপর আরোপ করতে চাই না। এবং সব রকমের পূর্ব ধারণা ত্যাগ করে আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হতে চাই। কোন বিষয়ে ইসলামী বিধান জানতে হলে আমাদেরকে আল-কুরআন ও আল-সুন্নাহ'র দ্বারস্থ হতে হবে। তারপর তো রয়েছে ইজমা ও কিয়াস। ইতিহাস গ্রন্থের কোন বর্ণনা ইসলামী বিধানের পক্ষে যুক্তি হতে পারে না; তবে কুরআন-সুন্নাহর অনুকূলে কোন বর্ণনা পাওয়া গেলে তা সহায়ক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; যত খ্যাতনামাই হোক না সে ঐতিহাসিক। প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ যারা বৈধ বলে দাবী করেন তারা প্রায়শ বলেন, রসূলুল্লাহসহ স. প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণ ভাস্কর্য ও ছবির ব্যাপারে কঠোর ছিলেন না। ফিকহ সম্পাদনা ও হাদীস সংগ্রহের পর এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে কঠোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এ লেখায় আমরা ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং ইমামদের মতামত যতটুকু সম্ভব কম উল্লেখ করব; আমরা রসূলুল্লাহসহ প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণ প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে কি মনোভাব পোষণ করতেন তা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে সচেষ্ট হব। পাশাপাশি ভাস্কর্যপন্থীরা ছাইপাশ যাই উপস্থাপন করে না কেন তা বিনা পর্যালোচনায় প্রত্যাখ্যান না করে তাতে কোন সারবস্তু আছে কিনা তা খতিয়ে দেখব।

হাদীসের আলোকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যারা শরী'আহ-এর উৎস হিসেবে হাদীস মানতে চান না। তাদের যুক্তির জবাব দেয়া কিংবা হাদীস বা সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা

নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আল-কুরআনের ঘোষণা অনুসারে রসূল স.-এর বাণীও ওহী হিসেবে পরিগণিত; যদিও তা *ওয়াহী গাইর মাতলু*। শরী'আহ-এর বিধি-বিধান নির্ধারণে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুরআনে ইসলামী আইনের রাজপথ বিধৃত হয়েছে। হাদীসের মাধ্যমেই আমরা ইসলামী শরী'আহ-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছি। হাদীস বাদ দিয়ে নামায-রোযাসহ অবশ্য পালনীয় অনেক দৈনন্দিন 'ইবাদাত-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ জানা সম্ভব হবে না। আর তাই হাদীস ইসলামের দ্বিতীয় উৎস বলে পরিগণিত হয়েছে।

এবারে আমরা হাদীসের আলোকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করব। চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বেশ কয়েকটি হাদীস বিপুল সংখ্যক সনদের সূত্রে হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা সমন্বিতভাবে হাদীসগুলো উপস্থাপনে সচেষ্ট হব।

১) 'আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ জিবরীল আ. এক নির্দিষ্ট সময়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রতিশ্রুত সময় এল, কিন্তু তিনি আসলেন না। রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি সেটি ফেলে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর দূতেরা তো ওয়াদার বরখেলাফ করেন না।' তারপর তিনি এদিক সেদিক তাকালেন, হঠাৎ তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা পেলেন। তিনি বললেনঃ আয়েশা! এ কুকুর কখন ঢুকল? তিনি (আয়েশা রা.) বললেনঃ আল্লাহর শপথ, আমি জানি না। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ওটি বের করে দেয়া হল। তারপর জিবরীল আ. এলেন। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেনঃ 'আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, আমি বসেও ছিলাম। এলেন না যে?' জবাবে জিবরীল বললেনঃ 'আপনার ঘরে যে কুকুর ছিল সেটি আমাকে বারণ করেছিল। আমরা সে'ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর বা ছবি/ভাস্কর্য থাকে।'[১] ১ *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল-লিবাস ওয়া আল-যীনাহ, (কায়রোঃ দার আল- হাদীস ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৫২৯

হাদীসটি মালিক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ, দারকুতনী ও তাবরানীসহ অনেক হাদীসবেত্তা উল্লেখ করেছেন।[২] শুধু সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যূন ১২ টি স্থানে বর্ণনাটি এসেছে। কমপক্ষে ৭ জন সাহাবী -ইবন 'উমর, ইবন আব্বাস (আবু তালহার মাধ্যমে), আবু তালহা, আবু হুরায়রা, 'আয়েশা ও মায়মূনাহ রা. ও আলী রা.- হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি 'খবরে ওয়াহেদ' নয়; বরং খবরে মশহূর।[৩] সুতরাং ইসলামী বিধান আহরণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল। আমরা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো স্পর্শ না করে শুধু মূল বিষয়বস্তুর ওপর দৃকপাত করব।[৪]

কোন কোন বর্ণনায় পুরো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাওবা শুধু মূল বক্তব্যটুকু আছে।

এ হাদীস থেকে জানা গেল ঘরে কুকুর বা ছবি/ভাস্কর্য থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সুতরাং ছবি টাঙানো বা ভাস্কর্য স্থাপন একটি গর্হিত কাজ। তবে এটি কোন পর্যায়ের (হারাম না মকরূহ পর্যায়ের) গর্হিত কাজ তা এ হাদীস থেকে জানা গেল না। ঘরে কিসের ছবি থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না তাও এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল না। তবে এ হাদীসের-ই অন্য একটি ভাষ্য যা সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে তা হতে জানা যায় যে, প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্য থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না।[৫] যেসব ছবি রাখার অনুমতি আছে সেগুলো থাকলে ফেরেশতা প্রবেশে কোন অসুবিধা নেই।[৬]
এ পর্যায়ে আমরা কিয়ামত দিবসে চিত্রকর ও ভাস্করদের শাস্তির উল্লেখ সম্বলিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করব। নবীপত্নি 'আয়েশা রা. কর্তৃক ছবিসম্বলিত পর্দা ঝুলানোকে কেন্দ্র করে এ হাদীসটি বর্ণিত হলেও অনেক বর্ণনায় ঘটনার বিবরণ ছাড়া শুধু মূল বক্তব্যটুকু এসেছে। বর্ণনাগুলো আমরা সমন্বিতভাবে উপস্থাপনে সচেষ্ট হব।
২) [আবু আল-দুহা] মুসলিম [ইবন সুবাইহ] হতে বর্ণিত, আমরা একবার মাসরূকের সাথে য়াসার ইবন নুমাইরের বাড়ীতে ছিলাম। তিনি (মাসরূক) বাড়ীর তাকে ছবি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি আবদুল্লাহকে [ইবন মাস'উদ] বলতে শুনেছি, তিনি নবী স. এর কাছে শুনেছেন, 'নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে সব চাইতে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত হবে চিত্রকর/ভাস্কর্য নির্মাতারা।'
বুখারী ও মুসলিম-দু'জনেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় ছবিটি ছিল যিশুমাতা মারয়াম আ.-এর।[৭] এ হাদীস থেকে বুঝা গেল চিত্রকর/ভাস্কর কিয়ামত দিবসে সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। বিষয়টি অযৌক্তিক মনে হতে পারে। চোর, মানুষ হত্যাকারী বা এ জাতীয় অপরাধীদের চাইতে চিত্রকররা অধিকতর বেশী শাস্তির অধিকারী হবে? তবে এ হাদীসের অন্যান্য ভাষ্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায় চিত্রকর/ভাস্কর সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে।
৩) আবু যুর'আ বলেন, আমি আবু হুরায়রা রা.-এর সাথে মদীনার একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে দেখলেন এক চিত্রকর ঘরের ওপরের দিকে ছবি আঁকছে। তখন তিনি (আবু হুরায়রা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, [আল্লাহ বলেন] 'যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চায় তার চাইতে অধিক জালেম আর কে হতে পারে? তারা বীজ সৃষ্টি করুক, ওরা পিঁপড়া সৃষ্টি করুক!'
বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় বাড়িটি ছিল মদীনার তৎকালীন শাসক মারওয়ান ইবন আল-হাকামের।[৮]
চিত্রাঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণটি এই হাদীস থেকে জানা গেল। কারণটি হল: প্রাণীর আকৃতি নির্ধারণ একমাত্র আল্লাহর কাজ। অতএব প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণের মানে হল সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। এ-

কালের কিছু 'আলেম এ-হাদীসের অপব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের মতে 'প্রাণীর ছবি আঁকা তখনই হারাম হবে যদি চিত্রকর আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকর্মে পাল্লা দেওয়ার নিয়তে তা করে থাকে। অন্যথায় প্রাণীর ছবি অঙ্কন হারাম হবে না।'[৯]
এ ধরণের বক্তব্য উদ্ধৃত হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ হাদীসে প্রাণীর ছবি অঙ্কনের কাজকেই আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মারওয়ান ইবন আল-হাকাম নিশ্চয় আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতার নিয়তে ছবি অঙ্কন করেননি। তবুও আবু হুরায়রা রা. ঐ কাজকে সৃষ্টি কাজে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেওয়ার নামান্তর বলে গণ্য করেছেন। এ হাদীসের চেতনা অনুসারে বলা যায় প্রাণীর ছবি অঙ্কন মাত্রই সৃষ্টির কাজে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার শামিল।
৪) আল-নাদর ইবন আনাস ইবন মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাসের কাছে বসে ছিলাম, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর উদ্ধৃতি না দিয়ে ফাতওয়া দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আমি ছবি আঁকি আর ভাস্কর্য বানাই। ইবন আব্বাস বললেন, 'কাছে এসো।' লোকটি কাছে গেলে ইবন আব্বাস বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ করবে কিয়ামতের দিন তাকে তাতে প্রাণ সঞ্চারের নির্দেশ দেয়া হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকে দিতে পারবে না।'[১০]
এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসাঈসহ অন্য অনেক সংকলক উল্লেখ করেছেন। নাসাঈ-এর বর্ণনা হতে জানা যায় লোকটি ইরাক হতে এসেছিল।[১১] বুখারীর বর্ণনা থেকে প্রশ্নকর্তার সওয়াল ও ইবন আব্বাসের জবাবের আরো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। লোকটি এসে বলল: 'আমার উপার্জন হয় হস্তশিল্পের মাধ্যমে; আমি এসব ছবি আঁকি। আপনি এ বিষয়ে ফাতওয়া দিন।'[১২] ইবন আব্বাস অত্যন্ত কোমলতা ও সহৃদয়তার সাথে তার প্রশ্নের জবাব দেন। এ হাদীস থেকে জানা গেল প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম। কারণ কিয়ামতের দিন আঁকিয়ে ও ভাস্করকে স্বীয় কর্মে প্রাণ ফুঁকে দিতে বলা হবে। প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার বিষয়টি প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট।
৫) 'আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি একটি বালিশ কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল; রসূলুল্লাহ স. যখন সেটি দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। তিনি [আয়েশা] তাঁর [রসূল স.] চেহারায় নারাজির ভাব দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট তওবা করছি। আমি কী পাপ করেছি?' রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'এ বালিশ কেন?' আয়েশা রা. বললেন, 'আমি এটি আপনার জন্য কিনেছি, যেন আপনি এর ওপর টেক দিয়ে বসতে পারেন আর মাথায় দিতে পারেন।' রসূলুল্লাহ বললেন: 'এইসব ছবির নির্মাতাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং

তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর।' অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[১৩]

৬) 'ইমরান ইবন হিত্তান হতে বর্ণিত, 'আয়েশা রা. তার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ তাঁর ঘরে ক্রুশ চিহ্নিত কোন বস্তু ধ্বংস না করে রাখতেন না।[১৪]

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণকারীর পরকালীন শাস্তির উল্লেখ সম্বলিত হাদীসগুলো সিহাহ সিত্তাসহ অনেক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। কেবল সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে কমপক্ষে ২০টি স্থানে এ-সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবী [ইবন 'উমর, 'আয়েশা, ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা.] হতে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত। এ পর্যন্ত উল্লেখিত হাদীসসমূহে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ বিষয়ে বেশ কিছু বিধান পাওয়া যায়। ইমাম নবববী (৬৭৬/১২৭৭) অনুসরণে আমরা তা উল্লেখ করছিঃ

'আমাদের ইমাম ও অন্যান্য 'আলেমগণ বলেন, প্রাণীর চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য নির্মাণ কঠিনতম হারাম, কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ হাদীসসমূহে উল্লেখিত কঠিন হুমকি দ্বারা ভীতি প্রদর্শিত। হীন কাজে ব্যবহার করার জন্য তৈরী করুক বা অন্য কোন কারণে তৈরী করুক-প্রাণীর ছবি তৈরী সর্বাবস্থায় হারাম। কারণ এটি সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষতা অর্জনের নামান্তর। কাপড়ে, বিছানায়, মুদ্রায়, পাত্রে বা প্রাচীরে যেখানেই অঙ্কন করুক না কেন, তা হারাম।

আর ছবিযুক্ত কোন কিছু যদি প্রাচীর বা দেয়ালে ঝুলানো থাকে, কিংবা তা যদি হয় পরিধেয় বস্ত্র বা পাগড়ী বা অন্য কিছু -যা তুচ্ছ ব্যবহার বলে পরিগণিত নয়- তাহলে সে ধরণের ব্যবহারও হারাম।'[১৫]

৬ষ্ঠ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, জড় পদার্থের ছবি অঙ্কন ও ব্যবহার হারাম হতে পারে যদি তা অন্য ধর্মের চিহ্ন বা উপাসনার বস্তু হয়।

ইবন হাজার বলেন, প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ব্যবহার হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে যার স্বতন্ত্র ছায়া আছে অর্থাৎ ভাস্কর্য এবং যার স্বতন্ত্র ছায়া নেই অর্থাৎ চিত্রকর্ম সবই সমান।[১৬] মোদ্দাকথা প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণ এবং এগুলোর সম্মানজনক ব্যবহার হারাম। এটি চার ইমামসহ পূর্বসূরি আলেমগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অভিমত। তাঁদের এ অভিমত মনগড়া নয়; উপর্যুক্ত হাদীসগুলোতে আমরা তাঁদের অভিমতের প্রতিধ্বনি দেখতে পেয়েছি।

এখানে ভিন্ন একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই; অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণ এমন কি অপরাধ যে এর জন্য

আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে? হাদীসের আলোকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

২য় হাদীস থেকে জানা জানা যাচ্ছে যে, চিত্রকর বা ভাস্কর কিয়ামত দিবসে কঠিনতম শাস্তি ভোগ করবে। এহেন কঠোর শাস্তির ঘোষণা কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য হয়। যেমন, ফিরআউনের অনুসারীদের ক্ষেত্রে কঠিনতম শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[১৭] ফিরআউন ছিল খোদাদ্রোহী শাসক যে নিজেকে খোদা দাবী করত। প্রশ্ন হল ভাস্কর্য নির্মাণ কি চুরি, ব্যভিচার কিংবা হত্যার চাইতে মারাত্মক কিংবা এগুলোর সমপর্যায়ের অপরাধ? এটা এমন কি অপরাধের কাজ যে তার জন্য ফিরআউনের অনুসারীদের মত শাস্তি দেয়া হবে? এ প্রশ্নের জবাবে 'আলেমগণ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন:

ক) আল-তাবারী বলেন, যেসব দেব-দেবীর পূজা করা হয় কেউ যদি জেনেশুনে তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তাহলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। ফলে সে ফিরআউনের অনুসারীদের ন্যায় কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হবে। অবশ্য কেউ যদি দেব-দেবী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করে তবে সেও গোনাহগার হবে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

খ) কেউ কেউ বলেন,কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার উদ্দেশ্যে ছবি/প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তবে সে কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হবে। অপরাপর প্রতিকৃতি নির্মাতারা তুলনামুলক কম শাস্তি ভোগ করবে।[১৮]

এসব ব্যাখ্যার পরও প্রশ্ন থেকে যায়: যে ব্যক্তি পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্য ছাড়া কিংবা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষ হওয়ার ইচ্ছা ছাড়া নিছক শিল্প চর্চার জন্য প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ করে সেও কি গোনাহগার হবে? আখেরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে? হাদীসের বক্তব্যসূত্রে বলা যায়, হাঁ, সেও গোনাহগার হবে। ইরাক হতে যে লোকটি ইবন আব্বাসের কাছে এসেছিলেন তিনি মুসলিম ছিলেন; তিনি নিশ্চয় মূর্তি নির্মাণ করতেন না কিংবা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার মানসে ছবি আঁকতেন না, তবুও ইবন আব্বাস তাকে চিত্রকরের শাস্তি বিষয়ক রসূলুল্লাহর স. বাণী শুনিয়ে দেন। মারওয়ান ইবন আল-হাকাম মুসলিম শাসক ছিলেন। তার বাড়ীর সিলিং-এ তিনি নিশ্চয় দেব-দেবীর ছবি অঙ্কন করেননি কিংবা আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকর্মে পাল্লা দেওয়ার নিয়তে ছবি অঙ্কনের আয়োজন করেননি, তবুও আবু হুরায়রা তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে প্রমাণিত হয় সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে কিংবা পূজা-অর্চনার নিয়ত না থাকলেও প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম।

কিছু ছবি ব্যবহার করা বৈধ

৭) আবদুর রহমান ইবন আল-কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা (আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি,

একদিন রসূলুল্লাহ স. আমার কাছে আসলেন; তৎপূর্বে আমি ছবিবিশিষ্ট একটি পর্দা দিয়ে বাসার তাক ঢেকে রেখেছিলাম। এটি দেখে তাঁর মুখের রঙ পাল্টে গেল, তিনি পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচাইতে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষ হতে চায়। 'আয়েশা রা. বলেন, পর্দাটি কেটে আমি একটি বা দু'টি বালিশ বানিয়েছিলাম।[১৯] শব্দে ও বাক্যে সামান্য পরিবর্তনসহ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় দেখা যায় পর্দাটিতে ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি ছিল।[২০] অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, পর্দা কেটে বালিশ বানানোয় রসূলুল্লাহ স. আপত্তি করেননি।[২১] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ স. বালিশটি ব্যবহার করতেন।[২২]

৮) আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার কাছে জিবরীল আ. এসে বললেন, গতরাতে আমি এসেছিলাম আপনার নিকট। আমাকে আপনার ঘরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে কিছু বস্তু; আপনার ঘরের দরজায় এমন পর্দা ছিল যাতে মানুষের ছবি ছিল, ঘরে সচিত্র পর্দা ছিল আর ছিল কুকুর। দরজায় যে ছবি আছে তার মাথা কেটে ফেলতে বলুন যাতে সেটি গাছের আকৃতি ধারণ করে, পর্দাটি কেটে দু'টি বসার গদি বানাতে বলুন আর কুকুরটি বের করে দিতে বলুন। রসূলুল্লাহ স. তা-ই করলেন।[২৩]

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদও প্রায় একই ভাষায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[২৪]

৯) 'সাঈদ ইবন আবুল হাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস রা.-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ এক লোক এসে বলল, হে আবু আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ আমার উপার্জন হয় হস্তশিল্পের মাধ্যমে; আমি এইসব ছবি আঁকি। জবাবে ইবন আব্বাস বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে যা শুনেছি তোমাকে তা-ই বলব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে, ভাস্কর্য নির্মাণ করবে, তাতে রূহ ফুঁকে না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। অথচ কখনোই সে রূহ ফুঁকে দিতে পারবে না। [এ কথা শুনে] লোকটি মারাত্মকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তার চেহারা হলুদ হয়ে গেল। [তার এ অবস্থা দেখে] ইবন আব্বাস বললেন, 'তোমার জন্য আফসোস! তুমি যদি তা করতেই চাও তবে গাছপালার ছবি আঁক আর এমন বস্তুর ছবি আঁক যার প্রাণ নেই।'[২৫]

হাদীসটি আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। প্রাসঙ্গিকতা ও অতিরিক্ত তথ্যের কারণে ভিন্ন সূত্র হতে আবার উল্লেখ করা হল। লোকটি ছিলেন এক ইরাকী কর্মকার; তিনি ছবি

আঁকতেন আর ভাস্কর্য বানাতেন। ইবন আব্বাসের কাছে এ বিষয়ে ফাতওয়া চাইলে তিনি সস্নেহে প্রশ্নকর্তাকে কাছে ডেকে আনেন। লোকটি কাছে এসে বসলে তার মাথায় হাত রেখে ইবন আব্বাস তাকে চিত্রকরের শাস্তি সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী শুনিয়ে দেন। এতে লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে যান; তার এ অবস্থা দেখে ইবন আব্বাস তাকে নিজস্ব পেশা বহাল রেখে জীবিকা উপার্জনের পথ বাতলে দেন।

১০) 'আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলতাম-আমার কিছু সখী ছিল যারা আমার সাথে খেলত। রসূলুল্লাহ সা. যখন ঘরে আসতেন তখন তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যেত। রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে আমার কাছে পাঠাতেন, আমি আবার তাদের সাথে খেলতাম।[২৬]

৭ম হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায় ছবি সম্বলিত কাপড় বা অন্য কোন বস্তুকে যদি টুকরো করে ছবির আকৃতি নষ্ট করা হয় তবে তা ব্যবহার করা বৈধ। তেমনি প্রাণীর ছবি যদি সম্মানজনক উপায়ে ব্যবহার না করে তুচ্ছ কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাও বৈধ। যেমন বিছানার চাদর বা পাপোষে প্রাণীর ছবি থাকলেও তা ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু প্রাণীর ছবি সম্বলিত পর্দার কাপড় ব্যবহার কিংবা দেয়াল বা প্রাচীরে ছবি টাঙানো হারাম। মূলত ইসলাম মূর্তিপূজার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করতে চায়। ছবি অঙ্কন, ছবি টাঙানো, ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ধীরে ধীরে ছবিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত করে। ছবি বা প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে তাতে ফুল দেয়ার মাধ্যমে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকে স্মরণ করার ফ্যাশন ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষকে স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায় হল তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা। রসূলুল্লাহ স.-এর কোন ছবি নেই। অথচ তাবৎ পৃথিবীর মানুষের মনে তাঁর স্মরণ চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

৮ম হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্যের মাথা কেটে ফেললে সেটি ব্যবহার করা যায়। ছবির মূল অংশ হল মাথা; মাথা কেটে ফেললে ছবি আর ছবি থাকে না। মাথা কেটে ফেললে ছবি বা ভাস্কর্য ব্যবহারের উপযোগিতাও হয়ত নষ্ট হয়ে যায়। এ বিধানের ওপর ভিত্তি করে আবক্ষ মূর্তি নির্মাণের বৈধতা দাবী করা যাবে না। আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ হারাম।

৯ম হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, গাছপালা ও অপ্রাণীবাচক বস্তুর ছবি আঁকা বৈধ। ইবন আব্বাস প্রশ্নকর্তা ভাস্করকে গাছ ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি অঙ্কনের অনুমতি দিয়েছেন।

১০ম হাদীসের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'উলামা ক্ষুদ্র ভাস্কর্য আকারে নির্মিত শিশুদের খেলনা পুতুল ব্যবহার করা বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে কিছু মতান্তর রয়েছে। ইবন বাত্তাল, দাউদী, ইবন আল-জাওযীসহ একদল 'আলেম বলেছেন, এই হাদীসটি মানসূখ।[২৭] তাঁদের এ অভিমতের পক্ষে যুক্তি আছে। আয়েশা

রা. পুতুল নিয়ে খেলতেন বাল্যকালে। আর ছবিসম্বলিত পর্দা টাঙিয়েছেন অনেক পরে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় রসূলুল্লাহ স. খায়বর বা তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় পুতুল খেলার বৈধতা দানের ঘটনাটি পূর্বের ঘটনা। অতএব ছবিসম্বলিত পর্দার হাদীস দ্বারা পুতুলের বৈধতার হাদীসটি মানসূখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরো কিছু ক্ষেত্রে ছবির ব্যবহার বৈধ, যেমন চিকিৎসা শিক্ষার উপকরণ হিসেবে প্রস্তুত প্রাণীর ছবিও বৈধ।

ছবি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে অতি সংক্ষেপে ইসলামী বিধান বর্ণনা করা হল।

ভাস্কর্য নির্মাণ কি বৈধ?

যারা দাবী করেন ভাস্কর্য নির্মাণ বৈধ তারা 'আলেম নন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেকালের বা একালের কোন 'আলেম দাবী করেননি যে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ বৈধ। আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি সেবী দাবী করছেন যে, ভাস্কর্য নির্মাণ ইসলামে বৈধ। তাদের মূল যুক্তি হল:

মক্কাবিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ স. কা'বাঘরের সকল ছবি বিনষ্ট করতে নির্দেশ দেন; তবে তিনি মারয়াম আ. ও ঈসা আ.-এর ছবি মুছতে নিষেধ করেন।

ভাস্কর্যের ইসলামী বৈধতার পক্ষে কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের লেখায় এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ আপত্তি করতে পারেন। হুমায়ূন আহমেদ তো ইসলামী পণ্ডিত নয়, তার বক্তব্য উল্লেখের প্রয়োজন কী? এটা সত্য যে, হুমায়ূন সাহেব ইসলামী পণ্ডিত নন; তবে তাঁর বড় একটি পাঠকশ্রেণী আছে যাদের বেশীর ভাগই তরুণ। নিজেদের ফেভারিট লেখকের বক্তব্যে তারা প্রভাবিত হতে পারেন; এই বিবেচনায় তাঁর যুক্তিটি আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামে কোন ব্রাহ্মণতন্ত্র নেই যে, ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলার অধিকার শুধু নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর অধিকারে থাকবে। হুমায়ূন আহমেদ বিখ্যাত এক গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছেন। সেটি হল ইবন ইসহাক রচিত নবী-জীবনী যেটি *সীরতে ইবন ইসহাক* নামে সমধিক পরিচিত। পাঠকবৃন্দ! আশ্চর্য হচ্ছেন নাকি? না, হুমায়ূন আহমেদ বইটি আরবীতে পড়েননি। তিনি আলফ্রেড গিয়োম নামক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ কর্তৃক অনূদিত *সীরতে ইবন ইসহাক* হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গিয়োম, ইংরেজিতে অনূদিত বইটির নাম দিয়েছেন *লাইফ অফ মুহাম্মদ*। আমরা এবার দেখব মি. গিয়োম কী অনুবাদ করেছেন আর ইবন ইসহাক কী লিখেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে গিয়োম লিখেছেন:

The apostle ordered that the pictures should be erased except those of Jesus and Mary.[২৮]

'রসূল স. মারয়াম ও ঈসা আ.-এর ছবি ব্যতিত সকল ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেন।'
এবার মূল গ্রন্থে ফেরা যাক। তৎপূর্বে গ্রন্থপ্রণেতা ইবনে ইসহাক সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করছি।

ইবন ইসহাক (১৫১/৭৬১) ছিলেন প্রথম ঐতিহাসিক যিনি রসূলুল্লাহ স.-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেছিলেন। তিনি বৃহৎ একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তাঁর গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি আজ অবধি পাওয়া যায়নি। ইবন ইসহাক জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রচারে কুফা, ফুসতাত, আলেকজান্দ্রিয়া ও বাগদাদসহ অনেক শহরে পরিভ্রমণ করেছেন। এইসব শহরে বহু শিষ্য তাঁর কাছে ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাত্রদের মাধ্যমে *সীরতে ইবন ইসহাকের* বিক্ষিপ্ত কিছু অংশ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে পৌছে। *সীরতে ইবন ইসহাকের* একটি সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন ইবন হিশাম (২১৩/৮২৮) যা *সীরতে ইবন হিশাম* নামে সমধিক পরিচিত। আল-ওয়াকিদী (৮২২ খৃ.), ইবন জারীর আল-তাবারী (৩১০/৯২৩), মুহাম্মদ ইবন সা'দ (২৩০/৮৪৫), মুসলিম ইবন কুতাইবা, আল-বালাযুরী (৮৯২ খ.) ও ইবন আল-আসীরসহ (১২৩৪ খ.) অনেক ঐতিহাসিক ইবন ইসহাকের শিষ্যদের বরাতে তাঁর গ্রন্থ হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া ইবন হিশামের বাদ দেয়া অংশ হতে আল-আযরাকী (৮৩৭ খৃ.) মক্কা নগরী সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো একত্র করেছেন তাঁর *আখবার মক্কা* গ্রন্থে। এতে বুঝা যায় *সীরতে ইবন ইসহাকের* পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক রূপ তাঁদের কাছে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে *সীরতে ইবন ইসহাকের* পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায়নি।

এখন প্রশ্ন হলঃ গিয়োম কোত্থেকে *সীরতে ইবন ইসহাকের* ইংরেজি অনুবাদ করলেন? প্রাচ্যবিদ Wüstenfeld কর্তৃক সম্পাদিত *সীরতে ইবন ইসহাকের* ইংরেজি অনুবাদ করেছেন গিয়োম। কিন্তু *সীরতে ইবন ইসহাক*-এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাহলে Wüstenfeld-ই বা *সীরতে ইবন ইসহাক* কোত্থেকে পেলেন, গিয়োমই বা কিভাবে অনুবাদ করলেন? গিয়োমের অনুবাদটি গভীর অভিনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করলে ধরা যাবে যে এটি মূলত *সীরতে ইবন হিশামের* অনুবাদ। তবে গিয়োম কিছুটা চালাকি করেছেন; তাবারী, আল-আযরাকীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইবন ইসহাকের সূত্রে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা হতে নির্বাচিত কিছু অংশ *সীরতে ইবন হিশামের* সাথে মিশিয়ে *সীরতে ইবন ইসহাক* বানিয়েছেন। সীরতে ইবন হিশামের সাথে কোন্ গ্রন্থের কোন্ অংশ জুড়ে দিয়েছেন তা মি. গিয়োম সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল-আযরাকীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি বোঝাতে Azr. এবং তাবারীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি বোঝাতে T ব্যবহার করেছেন। অতএব এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, যে গ্রন্থটিকে গিয়োম *সীরতে ইবন ইসহাক*-এর অনুবাদ নামে চালিয়ে দিয়েছেন সেটি আসলে *সীরতে ইবন ইসহাক*-এর অনুবাদ নয়। ওয়েলডান মি. গিয়োম! আর

এখন পশ্চিমের এদেশীয় অনুচরগণ বলছেন, রসূলুল্লাহ-এর সর্বপ্রাচীন জীবনী গ্রন্থে রয়েছে যে, তিনি কা'বাঘরে মারয়াম ও ঈসা আ.-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন। আমাদের এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হল যে, 'কা'বাঘরে রসূল স. কর্তৃক মারয়াম আ. ও ঈসা আ.-এর ছবি বহাল রাখার ঘটনা সীরতে ইবন ইসহাকে পাওয়া যায়' এটি তথ্যভিত্তিক দাবী নয়।

তবে আল-আযরাকী এটি বর্ণনা করেছেন তার *আখবার মক্কা* গ্রন্থে।

পর্যালোচনার সুবিধার্থে আমরা সনদসহ বর্ণনাটি উল্লেখ করছি:

আমাকে জনৈক দ্বাররক্ষক সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মাসাফি' ইবন শায়বা ইবন 'উছমান[২৯] হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ [মক্কা বিজয়ের দিন] বলেছিলেন, হে শায়বা! আমার হাতের নিচের ছবি ছাড়া অন্য সব ছবি মুছে ফেল।' রসূলুল্লাহ স. হাত সরিয়ে নিলে দেখা গেল ঈসা ইবন মারয়াম ও তদীয় মাতার ছবি।[৩০]

আল-আযরাকীর বর্ণনাটি আমরা পর্যালোচনা করব। তৎপূর্বে মক্কা বিজয়োত্তর কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকদের বরাতে উল্লেখ করতে চাই।

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ স. আপার মক্কা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। কাবাঘরের চত্বরে এসে দেখলেন এর চারপাশে ৩৬০ টি মূর্তি রয়েছে। আরবরা বছরের সংখ্যার সাথে মিল রেখে প্রতিমার সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল। কা'বাঘরের দরজার সামনে ছিল হুবল-এর মূর্তি, তার পাশে ছিল ইসাফ ও নায়েলার মূর্তি। রসূলুল্লাহ স. বলতে বলতে একটি লাঠি বা তীর দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করলেন; সাথে সাথে ওগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কা'বাঘরের অভ্যন্তরেও অনেক মূর্তি ছিল; সেগুলো অপসারণের পূর্বে তিনি কা'বাঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। 'উমর রা.-কে তিনি কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার দায়িত্ব দেন। তিনি কা'বাঘরের দ্বাররক্ষক 'উসমান ইবন তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সকল মূর্তি অপসারণ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ কা'বা-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন কাঠের তৈরী একটি কবুতর; তিনি সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। গনকের তীর হাতে ইবরাহিম আ.-এর ছবি দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন! ইবরাহিম আ. কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য গণনা করেননি।' রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে সকল মূর্তি অপসারিত হয়, সকল ছবি মুছে ফেলা হয়; উসামা ইবন যায়েদ রা. বালতিভরে পানি এনে দেয়াল ঘষে ছবিগুলো মুছে ফেলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে জাফরান রং দিয়ে ছবিগুলো মুছে ফেলা হয়। খুজা'আ গোত্রের মূর্তিটি ছিল অনেক ওপরে। আলী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাঁধে উঠে সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। এভাবে পৌত্তলিকতার চিহ্নমুক্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ কাবার অভ্যন্তরে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সকল ছবি মুছে ফেলা হয়ঃ

'মুশরিকদের কোন চিহ্ন তারা অবশিষ্ট রাখেননি, হয় মুছে ফেলেছেন নয় ধুয়ে ফেলেছেন।'[৩১]

'তিনি ছবিগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দেন অতঃপর সেগুলো মুছে ফেলা হয়।'[৩২]

'তারপর তিনি ঐসব ছবির ব্যাপারে নির্দেশ দেন, অতঃপর সেগুলো মুছে ফেলা হয়।[৩৩]

এখানে আরো অনেক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব যাতে প্রমাণিত হবে রসূলুল্লাহ কা'বাঘরে কোন ছবি বহাল রাখেননি। তিনি ছবি বহাল রাখতে পারেন না। এ লেখার শুরুতে আমরা দেখেছি বাড়ীতে ছবি টাঙানোর কারণে তিনি ভীষণ রাগ করেছেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি কা'বাঘরের মত পবিত্র স্থানে ছবি অবশিষ্ট রাখতে বলতে পারেন না। এসব প্রমাণাদি উপস্থাপনের পর আল-আযরাকীর বর্ণনাটির জবাব না দিলেও চলে। তবুও আমরা স্বচ্ছতার স্বার্থে আল-আযরাকীর বর্ণনাটি যাচাই করে দেখব।

পর্যালোচনার সুবিধার্থে আল-আযরাকীর বর্ণনাটি আবার উল্লেখ করছি।

আল-আযরাকীর বর্ণনাঃ

আমাকে জনৈক দ্বাররক্ষক সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মাসাফি' ইবন শায়বা ইবন 'উছমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ [মক্কা বিজয়ের দিন] বলেছিলেন, হে শায়বা! আমার হাতের নিচের ছবি ছাড়া অন্য সব ছবি মুছে ফেল।' রসূলুল্লাহ স. হাত সরিয়ে নিয়ে দেখা গেল ঈসা ইবন মারয়াম ও তদীয় মাতার আ.- এর ছবি।

পর্যালোচনা

এ উদ্ধৃতির প্রথম বর্ণনাকারী হল জনৈক দ্বাররক্ষক; ইনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। এ ধরণের বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি এ বর্ণনার মূলভাষ্য বা মতন ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে দেখা যাচ্ছে রসূলুল্লাহ স., শায়বাকে মারয়াম আ. ও ঈসা আ. এর ছবি মুছতে বারণ করেছেন। এই শায়বা কে? শায়বা ইবন 'উসমান ইবন আবু তালহা ছিলেন কা'বাঘরের দ্বাররক্ষক 'উসমান ইবন তালহার চাচাতো ভাই। শায়বার পিতা 'উসমান উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ দলের সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং আলী রা.-এর হাতে নিহত হন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিক ছিলেন; শুধু তাই নয় 'ইকরামা ইবন আবু জাহলসহ একদল লোক সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলেন। শায়বা হলেন তাঁদের একজন। পরবর্তীতে তিনি মুশরিক অবস্থায় হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রসূলুল্লাহ স.-

ক হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকটবর্তী হন। বিষয়টি বুঝতে পেরে রসূলুল্লাহ স. তাকে হুঙ্কার দিয়ে থামিয়ে দেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার হেদায়েতের জন্য দোয়া করেন। শায়বাও ইসলাম গ্রহণ করেন। যে লোকটি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিক অবস্থায় পালিয়েছিল রসূলুল্লাহ স. তাকে কা'বাঘরের মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের কল্পিত কাহিনী যে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য তা সহজেই অনুমেয়।[৩৪]

এটি একটি অপকৌশল; ইসলামের ওপর কালিমা লেপনের জন্য প্রাচ্যবিদগণ সব সময় এ ধরণের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বিশুদ্ধতম অসংখ্য বর্ণনা বাদ দিয়ে নিজেদের অপপ্রচারের পক্ষে যদি কোন অখ্যাত গ্রন্থের দুর্বলতম বর্ণনা পাওয়া যায় তবে তারা তা নিয়ে মাতামাতি করেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে আল-আযরাকীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত শরীআহ-এর কোন হুকুম কখনোই ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। বিশেষত তা যদি হয় অনির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক মক্কা বিজয়ের ঘটনা বহু ঐতিহাসিক লিখেছেন; তাদের কেউ এ কথা লিখেননি যে, রসূলুল্লাহ কাবাঘরে মারয়াম ও ঈসার ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ *তারিখুল ইসলাম*-এর রচিয়তা আল-যাহাবী বলেন, هذا امر لم نسمع به إلى اليوم 'এটি এমন বিষয় যা আমি এ যাবত শুনিনি।

উপসংহার

শরী'আহ উৎসের আলোকে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটি পরিষ্কার হল যে, প্রাণীর ছবি আঁকা ও ভাস্কর্য নির্মাণ এবং তা ব্যবহার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যারা দাবী করেন ভাস্কর্য নির্মাণ বৈধ তাদের যুক্তিগুলো তথ্যনির্ভর নয়। একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে মেনে চলা। শিল্পচর্চার দোহাই দিয়ে ইসলামী নিষেধাজ্ঞার সীমালংঘন করা মোটেই সমীচিন নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল-লিবাস ওয়া আল-যীনাহ, (কায়রোঃ দার আল- হাদীস ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৫২৯

২. সহীহ আল-বুখারী খ. ৩,পৃ. ২০৪, ২০৬; সহীহ মুসলিম, খ.৩, পৃ. ৫২৯-৩০; সুনান আল-তিরমিযী, বাব মা জাআ আন্নাল মালাইকাতা লা তাদখুল বায়তান ফীহী সূরাহ ওয়াল কালব (আল-মদীনাঃ মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী তা.বি.) খ.৪, পৃ. ২০০-০১; সুনান আবু দাউদ, বাব ফি আল-জুনুব উআখখিরুল গোসল (কায়রোঃ দার আল-হাদীস), খ.১, পৃ. ৫৮; সুনান আল-নাসাঈ, বাব আল-তাসবীর, খ. ৪, পৃ. ২১২-

১৩; সুনান ইবন মাজাহ, কিতাব আল-লিবাস: বাব আল-সুওয়ার ফি আল-বাইত, খ. ২, পৃ. ১২০৩; ইবন হাজর আল-আসকালানী, ফাতহ আল-বারী (কায়রো: দার আল-তাকওয়া লি আল-নাশর ওয়া আল-তাওযী' ২০০), খ. ১০, পৃ. ৪৩৩

৩. যে হাদীসের সনদের সকল পর্যায়ে কমপক্ষে তিনজন রাবী বা বর্ণনাকারী থাকে সেটি খবরে মশহূর। আর যে হাদীসে সনদের কোন না কোন পর্যায়ে তিনজনের কম রাবী থাকে সেটি খবরে ওয়াহেদ। [ড. মুহাম্মদ 'আজীজ আল-খাতীব, *উসূল আল-হাদীস* (বৈরুত: দার আল-ফিকর ১৯৮৯), পৃ. ৩৬৪]

৪. ঘরে ছবি/ভাস্কর্য বা কুকুর থাকলে কোন ধরণের ফেরেশতা প্রবেশ করে না বা কেন প্রবেশ করে না, এসব বিষয় জানতে হলে দেখুন, ইবন হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত খ. ১০, পৃ. ৪৩৩-৩৪

৫. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল-মাগাযী, বাব শুহূদ আল-মালাইকা বাদরান, খ. ২, পৃ. ৩৩৮

৬. ইবন হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত খ. ১০, পৃ. ৪৩৪

৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৪; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৩৬

৮. *সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৩, পৃ.২০৫; *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৭

৯. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলি, *আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশক: দার আল-ফিকর ১৯৮৪), খ. ৪, পৃ. ২৬৭০

১০. *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩; পৃ. ৫৩৭

১১. *সুনান আল-নাসাঈ*, বাব আল-তাসাবীর, খ.৪, পৃ. ২১৫

১২. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল-বুয়ূ', খ. ১, পৃ. ৫২৬-২৭

১৩. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

১৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫

১৫. *সহীহ মুসলিম বি শরহ আল-নওয়াবী* (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৪), খ. ৭, পৃ. ৩৪১-৩৪৪

১৬. আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৩৬

১৭. আল-কুরআন ৪০:৪৬

১৮. ইবন হাজর, প্রাগুক্ত

১৯. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৩৩

২০. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩২

২১. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩২

২২. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

২৩. *সুনান আল-তিরমিযী*, বাব মা জাআ আন্নাল মালাইকাতা লা তাদখুলু বায়তান ফিহী কালব ওয়া লা ছূরাহ (আল-মদীনা: মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী তা.বি.) খ. ৪, পৃ. ২০১

২৪. *সুনান আবু দাউদ*, খ.৪, পৃ. ৭৩
২৫. সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫২৬-২৭
২৬. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল-আদবঃ বাব আল-ইনবিসাত ইলা আল-আনাস, খ. ৩, পৃ. ২৪২
২৭. ইবন হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০ পৃ. ৬০২
২৮. Ibn Ishaq (Translated by Alfred Guillaume), *The Life of Mohammad* (Oxford University Press 1955), p. 552
২৯. মাসাফি' ইবন শায়বা' আল-আযরাকী এভাবেই উল্লেখ করেছেন। যদিও মাসাফি' শায়বার পুত্র নন; বরং পৌত্র। মাসাফি'র পিতার নাম আবদুল্লাহ। সুতরাং তাঁর পূর্ণনাম হবে মাসাফি' ইবন আবদুল্লাহ ইবন শায়বা। তবে কোন ব্যক্তিকে পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করার রেওয়াজ আরবে ছিল। সে-রেওয়াজ অনুযায়ী সম্ভবত আল-আযরাকী 'মাসাফি' ইবন আবদুল্লাহ ইবন শায়বা'-এর পরিবর্তে 'মাসাফি' ইবন শায়বা' উল্লেখ করেছেন।
৩০. আল-আযরাকী, *আখবার মক্কা* (মক্কা আল-মুকাররমাঃ মাতাবি' দার আল-ছাকাফাহ ১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ১৬৮
৩১. ইবন আবু শায়বা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪০৬
৩২. ইবন কায়্যিম আল-জুযিয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮
৩৩. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ. ৩৪৫
৩৪. ইবন আল-আছীর, *উসুদুল গাবাহ* (বৈরুতঃ দার আল-শা'ব তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৫৩৪; আল-মিয্যি, *তাহযীব আল-কামাল* (বৈরুতঃ মুআস সাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯১), খ. ১২, পৃ. ৬০৪-০৭

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ : ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ঃ ২৫-৩২

যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কে ইয়াহূদী-খৃস্ট ধর্মের বিধান ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ মূসা

॥ চার ॥

[নিবন্ধে বিষয়টি দুই পর্যায়ে দুই কিস্তিতে আলোচনা করা হবে। প্রথম কিস্তিতে ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মে ব্যভিচার, এই অপরাধ সম্পর্কে তাওরাত-ইনজীলের বক্তব্য ও অনুমোদিত শাস্তি, বর্তমান খৃস্টান বিশ্বের নৈতিক অবস্থা, পাদ্রীদের বর্তমান ভূমিকা ইত্যাদি। দ্বিতীয় কিস্তিতে দীন ইসলামে উপরোক্ত অপরাধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, এতদবিষয়ক ইসলামী বিধান এবং বর্তমানে বাংলাদেশে বলবৎ বিধানের সাথে তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি — নিবন্ধকার]।

দু'জন নারী-পুরুষের দাম্পত্য বন্ধনই পরিবারের প্রধান ভিত্তি। আবহমান কাল থেকে এই পবিত্র ব্যবস্থা চলে এসেছে এবং এর মাধ্যমে মানব গোষ্ঠীর ধারা-বাহিকতা ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে। সভ্য, অসভ্য, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানব গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক জীবন একটি পবিত্র ও অনুপম ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী-পুরুষ তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে নিজেদের চরিত্র- নৈতিকতার হেফাজত করছে এবং মানব বংশের পবিত্র ক্রমধারা অব্যাহত রেখেছে। বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার সকল ধর্মেই নিন্দনীয়, এমনকি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অনাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কেউই মর্যাদার চোখে দেখে না।

অবৈধ যৌনাচার স্বামী-স্ত্রীর জীবনে বিভিন্নমুখী বিশৃংখলা, অশান্তি, কলহ-বিবাদের সূত্রপাত করে, এমনকি দাম্পত্য সম্পর্কের তিক্ততাপূর্ণ অবসান ঘটায়। পরিবারের আর্থিক ভিত দুর্বল করে এবং সন্তানদের জন্য বয়ে আনে সুষ্ঠু-শান্তিময় জীবনের অনিশ্চয়তা। অবৈধ যৌনাচারের ফলস্বরূপ যে মানব সন্তানটি পৃথিবীতে আসে, তাকে কেউই সম্মানের দৃষ্টিতে সুনজরে দেখে না, বরং অশ্রাব্য ভাষায় মন্তব্য ছুড়ে মারে। অথচ এ মানব সন্তানটি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নির্দোষ।

লেখক ঃ গবেষক, গ্রন্থকার। একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা।

অবৈধ যৌনাচার শুধু নৈতিক ও ধার্মিক জীবনের জন্যই ক্ষতিকর নয়, স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এর ক্ষতি ভয়ংকর, গা শিউরে ওঠার মতো। আজকের অত্যাধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মরণব্যাধি এইডস-এর মূল উৎস হলো অবৈধ যৌনাচার, যার কোন কার্যকর প্রতিষেধক আজো আবিষ্কৃত হয়নি। এ ভয়াবহ ব্যাধি সম্পর্কে বহু কাল পূর্বেই রসূলুল্লাহ স. ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, 'কোন জাতির মধ্যে অবৈধ যৌনাচারের বিস্তার ঘটলে তাদের মধ্যে দূরারোগ্য ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়'। অবৈধ যৌনাচারের লিলাভূমি খৃস্টান পাশ্চাত্যে বর্তমানে এই দূরারোগ্য ব্যাধির বিস্তার ঘটেছে এবং সেখান থেকে তা প্রাচ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে যেহেতু এখনো যৌন জীবন সুনিয়ন্ত্রিত, তাই এখানে উপরোক্ত রোগের আক্রমণ নেই বললেই চলে। ছিটেফোঁটা যা দেখা যায় তাও পাশ্চাত্যের প্রভাবে এবং তাদের আমদানী।

আসমানী ধর্মসমূহে যেনা ও তার শাস্তি

অবৈধ যৌনাচারকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'যেনা' (বাংলা প্রতিশব্দ ব্যভিচার) বলা হয়। সহজ ভাষায় দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌনমিলনকে 'যেনা' বলে। ইয়াহূদী, খৃস্ট ও ইসলাম এই তিনটি ধর্মেই 'যেনা' একটি গর্হিত, নৈতিক ও ফৌজদারী অপরাধ এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। তাওরাতের (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) বিধান নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ.-কে যে দশটি আজ্ঞা দান করেন তার একটি হলো, 'ব্যভিচার করিও না' (যাত্রাপুস্তক, ২০ ঃ ১৪)।

আল-কুরআন বলছে ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً.

'তোমরা যেনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' (১৭ঃ৩২)।

তাওরাত বলছে ঃ

'তুমি আপন কন্যাকে বেশ্যা হইতে দিয়া অপবিত্র করিও না, পাছে দেশ ব্যভিচারী হইয়া পড়ে ও দেশ কুকার্যে পূর্ণ হয়' (লেবীয় পুস্তক, ১৯ ঃ ২৯)।

আল-কুরআন বলছে ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ.

'তোমরা তোমাদের যুবতীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না' (২৪ঃ৩৩)।

তাওরাতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি অপরের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে" (লেবীয় পুস্তক, ২০ ঃ ১০; আরো দ্র. ২০ ঃ ১১-১২)।

'কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে; এইরূপে তুমি ইসরাঈলের মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে' (দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ ঃ ২২)।

'যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা কোন কুমারীকে নগরমধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। সেই কুমারীকে বধ করিবে, কেননা নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরুষকে বধ করিবে, কেননা সে আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে। এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে' (দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ ঃ ২৩-২৪)।

আল-কুরআনের বাণী ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'যেনাকারিণী ও যেনাকারী—তাদের প্রত্যেককে তোমরা এক শত বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে—যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাকো। মু'মিনদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' (২৪ ঃ ২)।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াতে অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড' রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ও তাঁর বাস্তব কার্যক্রম তথা হাদীসে বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীসে মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামী, গামেদ গোত্রীয় এক নারী এবং এক শ্রমিকের নিয়োগকর্তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমায় রসূলুল্লাহ স.-এর রায় এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালের ঘটনাসমূহ শক্তিশালী দলীল।

ধর্ষণ

বলপ্রয়োগে বা জোরপূর্বক যেনা সম্পর্কে তাওরাতের (বাইবেলের) বিবরণ নিম্নরূপঃ 'কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগ্দত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া বলপূর্বক তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ মাত্র হত হইবে; কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবে না। সে কন্যাতে প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপ নাই।.... কেননা সেই

পুরুষ মাঠে তাহাকে পাইয়াছিল। ঐ বাগ্দত্তা কন্যা চীৎকার করিলেও তাহার নিস্তারকর্তা কেহ ছিল না'। (বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ ঃ ২৫-২৭)
ইসলামী বিধানের সাথে বাইবেলের উপরোক্ত বিধানের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

জারজ সন্তান

জারজ সন্তান সম্পর্কে তাওরাতের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ 'জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না। তাহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবে না' (বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩ ঃ ২)। ইসলামী বিধানের সাথে এই বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জারজ সন্তান নিষ্পাপ। কারণ তার জন্মসূত্রের উপর তার কোন ভূমিকা নেই।

ইয়াহূদী ধর্মে ব্যভিচারের শাস্তি

উপরে উল্লিখিত তাওরাতের বাণী মোতাবেক ইয়াহূদী ধর্মে অবৈধ যৌনাচার একটি গর্হিত কাজ এবং মারাত্মক দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে (রজম) মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ.-কে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন উপরোক্ত শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দুষ্টাচার লোপ করার ব্যবস্থা করেন।

ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ হযরত ঈসা আ.-কে একাধারে অপরাধী ও আল্লাহর বিধান লংঘনকারী সাব্যস্ত করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা থেকেও তাদের ধর্মে যে ব্যাভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তা প্রমাণিত হয়। ইয়াহূদী অধ্যাপক ও ফরীশীগণ ব্যভিচারে ধৃতা এক নারীকে হযরত ঈসা আ.-এর দরবারে উপস্থিত করে বললো, হে গুরু! এই নারী ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় ধরা পড়েছে। ব্যবস্থায় মোশি (মূসা আ.) এই প্রকার লোককে পাথর মারার আজ্ঞা আমাদের দান করেছেন। তবে আপনি কি বলেন? তারা তাঁকে বিপদে ফেলার জন্যই একথা বললো, যাতে তাঁর নামে দোষারোপ করার সূত্র পেতে পারে। (দ্র. বাইবেলের নূতন নিয়ম, যোহন, ৮ ঃ ১-৬)।

হযরত ঈসা আ.-এর বিরোধী ইয়াহূদী পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিবিধ। হযরত ঈসা আ. যদি তাওরাতের বিধানমত অভিযুক্ত নারীকে ব্যভিচারের শাস্তির রায় না দেন তবে তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই বলে অপপ্রচার চালানোর সুযোগ পাবে যে, একদিকে তিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন এবং তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করছেন, অপরদিকে শাস্তির রায় না দিয়ে তাওরাতের বিধান লংঘন করছেন। আবার তিনি যদি তাওরাতের বিধানমত উপরোক্ত নারীর মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন, তবে সমসাময়িক ইয়াহূদী রাজার আইনে তাঁকে সহজেই অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে যে, তিনি রাষ্ট্রীয় বিধান লংঘন করেছেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ইয়াহূদী রাষ্ট্রীয় বিধানে ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়েছিল।

হযরত ঈসা আ. নবী সুলভ প্রজ্ঞার মাধ্যমে যথার্থ রায়ই প্রদান করলেন। তিনি অভিযুক্ত নারীর প্রতি ইশারা করে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের বললেন, তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই নারী যে গর্হিত অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কখনো সেই গর্হিত অপকর্মে লিপ্ত হয়নি সে তাকে পাথর মারুক। এই রায় শোনামাত্র ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ একে একে স্থান ত্যাগ করলো, শুধু ঐ নারীই একাকী দাঁড়িয়ে থাকলো। হযরত ঈসা আ. তাকে তওবা করালেন এবং উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। (দ্র. বাইবেলের নূতন নিয়ম, যোহন, ৮ ঃ ৭-১১)

অনুরূপ একটি ঘটনা মহানবী স.-এর সময়ও ঘটেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। ইয়াহূদীরা মহানবী স.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অবহিত করলো যে, তাদের মধ্যকার একজোড়া নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ধরা পড়েছে। মহানবী স. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যভিচারের শাস্তি (রজম) সম্পর্কে তোমরা তাওরাতে কী বিধান পাচ্ছো? তারা বললো, আমরা এসব অপরাধীকে অপমান করি ও বেত্রাঘাত করি। (ইয়াহূদী পণ্ডিত ও পরে ইসলাম গ্রহণকারী) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. তাদের বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। তাওরাতে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা)-এর বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে এলো এবং খুলে তাদের এক ব্যক্তি রজম সম্পর্কিত নির্দেশটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে তার আগে-পরের অংশ পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন, তোমার হাত সরাও। অতএব সে তার হাত সরালে রজম সম্পর্কিত বিধান দেখা গেলো। পাঠকারী লোকটি বললো, হে মুহাম্মদ! আপনি সত্য কথা বলেছেন। তাতে রজম সংক্রান্ত বিধান বিদ্যমান আছে। অতএব রসূলুল্লাহ স. অপরাধীদ্বয় সম্পর্কে রায় প্রদান করলে তদনুযায়ী তাদের রজম করা হয়। ইবনে উমর রা. বলেন, আমি যেনাকারী পুরুষটিকে দেখেছি যে, সে স্ত্রীলোকটিকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য তার দিকে ঝুঁকে পড়তো।[১]

উপরোক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা মীমাংসা করে না, তারাই কাফের' (সূরা মাইদা, নং ৪৪)।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা মীমাংসা করে না, তারাই যালেম' (ঐ সূরা, নং ৪৫)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা মীমাংসা করে না, তারাই পাপাচারী' (ঐ সূরা, নং ৪৭)।[২]

ইয়াহূদী রাষ্ট্রে এক পর্যায়ে তাওরাতের উপরোক্ত দণ্ডবিধি বলবৎ থাকলেও পরবর্তী কালে এবং হযরত ঈসা আ.-এর আবির্ভাবের বহু পূর্বে ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ, আইনজ্ঞ, রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ উপরোক্ত বিধানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাতিল করে দিয়েছিল। রসূলুল্লাহ স. ইয়াহূদীদেরকে তাওরাতের বিধান বাতিল করে তদস্থলে মানব রচিত বিধান প্রবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনেও রজমের বিধান কার্যকর ছিল। কিন্তু আমাদের সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিগণ ব্যাপকভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা উপরোক্ত অপকর্ম করে ধরা পড়লে তাদেরকে বিচারের আওতায় না এনে ছেড়ে দেয়া হতো। কিন্তু কোন সাধারণ লোক উপরোক্ত অপরাধে ধৃত হলে তাকে আইনের আওতায় এনে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হতো। পরিশেষে আমরা বললাম, তোমরা সকলে এসো, আমরা সম্মিলিতভাবে একটি শাস্তির বিধান চালু করি, যা গণ্যমান্য ও সাধারণ সকলের বেলায় প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আমরা ব্যভিচারের শাস্তি মুখমণ্ডলে কালি মাখানো এবং বেত্রাঘাত করাকেই স্থির করে নিলাম, পাথর নিক্ষেপের পরিবর্তে। এই বিবরণ শুনে রসূলুল্লাহ স. বলেন, হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তোমার নির্দেশ 'রজম'-এর শাস্তি কার্যকর করে তোমার বিধানকে পুনর্জীবিত করলো, যা তারা বাতিল করে দিয়েছিল।[৩]

যেনা সম্পর্কে তাওরাত ও ইনজীলের বিধান

ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) এবং খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও ইনজীল (বাইবেলের নূতন নিয়ম)-এর যেনা (ব্যভিচার) সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে তার সারমর্ম হলো ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ (ক) যেনা একটি দুষ্টাচার; (খ) যে নারী-পুরুষ যেনায় লিপ্ত হবে তাদের উভয়কে কঠোর শাস্তি দিতে হবে; (গ) শাস্তির ধরন ও তা কার্যকর করার পদ্ধতি হলো–(১) উভয়ের মৃত্যুদণ্ড হবে এবং (২) তা প্রকাশ্য দিবালোকে (৩) তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ (রজম) করে কার্যকর করতে হবে; (ঘ) এই পদ্ধতিতে সমাজ থেকে উপরোক্ত দুষ্টাচারকে উৎখাত করতে হবে।

পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের সমালোচনা

এ পর্যন্ত ব্যভিচার সম্পর্কে বাইবেলে যেসব বক্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আল-কুরআনের বক্তব্যের সাথে তার হুবহু সামঞ্জস্য রয়েছে। অপরাধ সম্পর্কে

দৃষ্টিভঙ্গি, অপরাধের শাস্তি এবং তা কার্যকর করার পদ্ধতি সব দিক থেকেই মিল রয়েছে। পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম যেনার যে শাস্তি অনুমোদন করেছে, তাকে তারা বর্বর, মানবতা বিরোধী, আদিম ও বর্তমান সভ্যতার জন্য লজ্জাজনক ইত্যাদি শব্দে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু তারা কখনো নিজেদের তাওরাত-ইনজীলের পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখেন না যে, তাদের ধর্মও ইসলাম ধর্মের অনুরূপ ব্যভিচারের একই শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে।
আসলে তাদের সমালোচনার উদ্দেশ্য ভিন্নতর। তারা যেভাবে তাদের নিকট রক্ষিত আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতপটে নিক্ষেপ করে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তদ্রূপ মুসলমানদেরকেও তারা আল-কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আল-কুরআন আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে ঃ

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.

'ইয়াহূদী-খৃস্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যাবত না তুমি তাদের জাতির অনুসরণ করো' (সূরা বাকারা ঃ ১২০)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ.

'হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে (ইয়াহূদী-খৃস্টান), তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে' (সূরা আল ইমরান ঃ ১০০)।

বর্তমান খৃস্টান বিশ্বে যেনার মহামারী

পাশ্চাত্যের খৃস্টান দেশসমূহে যেনা-ব্যভিচার খুবই সহজলভ্য। তরুণ-যুবা, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অতি ব্যাপক হারে যেনায় লিপ্ত। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের প্রবীণ কর্তা ব্যক্তিরাও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ধরা পড়ে হেনস্তা হচ্ছেন, পদ হারাচ্ছেন। এক আমেরিকান সমাজের তিরিশ লাগোয়া যুবক-যুবতীদের শতকরা তিরিশ ভাগ জারজ সন্তান, যাদের বেশির ভাগেরই পিতৃ-পরিচয় নেই। ভ্যাটিকানের পোপকে মাঝে-মধ্যে ইটালিয়ান সমাজকে নরকবাসী বলে মন্তব্য করতেও শোনা যায়।

খৃস্টান ধর্মগুরুদের ভূমিকা

খৃস্টান বিশ্বে এবং স্বয়ং পোপের সাম্রাজ্যে ব্যভিচারের ও অবৈধ সন্তান উৎপাদনের যে ভয়াবহ সয়লাব চলছে, তার বিরুদ্ধে খৃস্টান ধর্মগুরুদের সোচ্চার কোন কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না। মানবতা বিধ্বংসী এই অনাচারকে সমূলে উৎখাত করার জন্য তাদের কোন কর্ম বা প্রচার পরিকল্পনা লক্ষ করা যাচ্ছে না। আসলে তারা তাদের

সমাজ সম্পর্কে মারাত্মকভাবে হতাশ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। তারা চিন্তা করছেন যে, গোটা খৃস্টান বিশ্ব ব্যাপী যেনা-ব্যভিচারের যে প্রকাশ্য ও ব্যাপক অনাচার চলছে তার ছোবল থেকে খৃস্টান জাতিকে মুক্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

বর্তমানে তারা একটি বিষয়ই জোরেশোরে প্রচার করছেন, 'ঈশ্বর-পুত্র যীশু গোটা মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জীবন দিয়েছেন। যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে যত বড়ো পাপীই হোক, সহজেই নিস্তার পেয়ে প্যারাডাইজ-এ পৌঁছে যাবে'। তাদের এই বিশ্বাসের পেছনে তাদের ধর্মগ্রন্থে কোন ভিত্তি আছে কিনা তা আমাদের অজ্ঞাত। তবে আমরা বাইবেল থেকে জানতে পারি 'সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না। প্রতিজন আপন আপন পাপপ্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে' (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, ২৪ ঃ ১৬)। আল-কুরআনের বাণী ঃ

وَلَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْـرى.

'প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' (আল-কুরআন, ৬ঃ১৬৪, ১৫ঃ১৭০, ৩৫ঃ১৮, ৩৯ঃ৭, ৫৩ঃ৩৮)।

তথ্য নির্দেশিকা

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, বাব রাজমিল ইয়াহূদ, নং ৪৪৩৭/২৬ ও ৪৪৪০/২৮; সুনাব আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, বাব ফী রাজমিল ইয়াহূদিয়্যায়ন, নং ৪৪৪৬-৪৪৫৫; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব রাজমিল ইয়াহূদ, নং ২৫৫৮; সুনান আদ-দারিমী, হুদূদ, বাব ১৫, নং ২৩২১; সহীহ বুখারী, হুদূদ, বাব (৩৭) আহকামি আহলিয-যিম্মাহ, নং ৬৮৪১; কিতাবুল মানাকিব, বাব ২৬, নং ৩৬৩৫; তাফসীর, বাব ৬, নং ৪৫৫৬; হুদূদ, বাব ২৪, নং ৬৮১৯; তাওহীদ, বাব ৫১, নং ৭৫৪৩। মূল বক্তব্য মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ থেকে গৃহীত, আবওয়াবুল হুদূদ ফিয-যিনা, নং ৬৯৬ (বঙ্গানু.)। বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় কম-বেশি আছে।

২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, বাব রাজমিল ইয়াহূদ, নং ৪৪৪০/২৮।

৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, নং ৪৪৪০/২৮; সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, বাব (২৫) ফী রাজমিল ইয়াহূদিয়্যায়ন, নং ৪৪৫০। বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় কিছুটা শাব্দিক পার্থক্যসহ বক্তব্য কম-বেশি আছে।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩-৩৬

ইমাম গাজালীর অর্থনৈতিক দর্শন

ড. শওকী আহমদ দুন্য়া

ইমাম গাজালী মানব জীবনের অর্থনৈতিক দিকের প্রতি যেরূপ গুরুত্ব দিয়েছেন পূর্বের কোন ইসলামী চিন্তাবিদকে তেমনটি দেখা যায়নি। আমরা আলোচনার মাধ্যমে এ সত্যটি যথাযথ ভাবে প্রমাণ করবো।

ইমাম গাজালী অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে দর্শনগত, বিশ্লেষণাত্বক এবং আচরণগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

দর্শনগত দিকে আমরা ইমাম গাজালীর দর্শনের চাবিকাঠি একটি মৌলিক বিষয়ে প্রতীয়মান হয় বলে দেখতে পাই, তাহলো; মানুষের জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্য হাসিলের অছিলা বা উপায় কি।

গাজালী মানুষের জীবনের লক্ষ উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে ইমাম গাজালী অর্থনৈতিক বিষয় সমূহের প্রতি আলোকপাত করেছেন। মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ কি? এবং এই লক্ষে পৌছার উপায় কি? এবং এই উদ্দেশ্য সমূহ হাসিলের জন্য ব্যবহৃত উপায় সমূহের সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতি কি? এই পদ্ধতি থেকে মানুষের বিচ্যুত হওয়ার লক্ষণগুলো কি? এসব মৌলিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুসন্ধানের কাজই ইমাম গাজালীকে সর্বদা বিচলিত করেছে এবং তার অনেক গ্রন্থেই বিশেষ করে 'এহইয়ায়ে উলূমুদ্দিন' গ্রন্থে তার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল। মুসলমানের জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালের সাফল্য লাভ।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, ধন সম্পদ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। সতুরাং আকিদা ও অর্থনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আর তা হল উপায় ও উদ্দেশ্যের সম্পর্ক। এটাই ইমাম গাজালীর অর্থনৈতিক দর্শনের মূল বিষয়। অর্থনীতি মানুষের জীবনে অবশ্যই প্রয়োজন, তার ঈমান আকিদার জন্যও নেহায়েত প্রয়োজন, কেননা এর উপরই মানুষের জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সাধন নির্ভর করে। এর অর্থ হলঃ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কোন বিলাসিতা এবং ঐচ্ছিক কিংবা আনুষঙ্গিক বিষয় নয় বরং তা আবশ্যকীয়। তবে এর প্রয়োজন উপায় হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে, উদ্দেশ্য হিসেবে নয়। ইমাম গাজালী মানবজীবনের শুধুমাত্র এই সত্যটি উদঘাটন করেই

লেখক : প্রফেসর, ইসলামী অর্থনীতি বিভাগ, ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সউদি আরব।

ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি এ ক্ষেত্রে মানুষের জন্য কোন সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তাও ব্যাখ্যা করেছেন।

গাজালীর দৃষ্টিতে সঠিক পদ্ধতি হল, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ অছিলা বা মাধ্যম ব্যবহার করা, তার বেশী নয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু মাধ্যম ব্যবহার করা নেহায়েত প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহার করেই মানুষের ক্ষান্ত থাকা উচিত এর উপরই তিনি বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন যা পরবর্তীতে আমরা তার বিভিন্ন আলোচনায় জানতে পারবো।

ইমাম গাজালী সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ নয় বরং বিস্তারিত আলোচনা এবং এই পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার লক্ষণ সমূহও সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিচ্যুতি কিংবা স্খলনগুলোর প্রধান দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হল, সংশ্লিষ্ট মাধ্যম ব্যবহারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি এবং তার মাধ্যমে সকল লক্ষ উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা, আর এটা প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থি বৈ কি। দ্বিতীয়টি হল, ঐ মাধ্যমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং তার সাহায্য ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করা। আর এটা আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে সাংঘর্ষিক।

এটাই ইমাম গাজালীর অর্থনৈতিক দর্শন হিসেবে অভিহিত। তাঁর মতে যাদের জ্ঞান বুদ্ধি আছে তাদের উদ্দেশ্য পরকালে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করা, আর আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য ইলম ও আমল ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সুস্থ দেহ ছাড়া এ দুটো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয় আর দেহের সুস্থতা রক্ষা খাদ্য ও পানীয় ছাড়া সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে অতীতের কেউ কেউ বলেছেন, খাদ্য গ্রহণ দীন বা ধর্মের অংশ। এ ব্যাপারে সত্যভাষী মহান আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, 'ওহে, তোমরা উত্তম জিনিষ ভক্ষণ কর এবং নেক আমল কর।' অতঃপর যে ব্যক্তি ইলম আহরণ ও আমল সম্পাদনের উদ্দেশ্যে খাদ্য গ্রহণ করে এবং তাকওয়া বা আল্লাহভীতিকে আরও মজবুত করতে চায়, তাকে নিরর্থক ও গুরুত্বহীন রূপে নিজকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, এমন ভাবে ভুরিভোজন করবে যেভাবে চুতষ্পদ জন্তু মাঠে চরে ভুরিভোজন করে। কেননা যে বস্তু দীনের দিকে মানুষকে ধাবিত করে এবং তা হাসিলের উপায় স্বরূপ, তার উপর দীনের আলো প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত। আর অবশ্যই দীনের আলো হলো তার শিষ্টতা ও আদর্শ, আল্লার বান্দারা যার রজ্জু দিয়ে নিজদেরকে আবদ্ধ করে এবং পরহেজগার ব্যক্তিরা যার লাগাম আকড়ে ধরে রাখে, যাতে খাদ্যের আকর্ষণ তার দেহ ও মনে তৃপ্তি যোগায় এবং যাতে সে গুনাহ প্রতিরোধকারী এবং পূন্য হাসিলকারী হতে পারে, যদিও এতে নফসের ভাগটাই বড়। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি যে লোকমা তার নিজ মুখে ও তার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে তাতে অবশ্যই পূন্য লাভ করবে যদি সে দীনের স্বার্থে এ কাজ করে থাকে, আর দীনের জন্য রয়েছে অনুসারীগণ, তাদের শিষ্টতা ও সৎ কাজগুলো'।

অন্যস্থানে তিনি বলেছেন, 'মহান প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা পরকালকে পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রস্থল করেছেন আর পৃথিবীকে করেছেন ধৈর্যধারণ, ক্লান্তি, কর্মকান্ড ও জীবিকার্জনের ক্ষেত্রস্থল।

সুতরাং দুনিয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আশ্রয় স্থলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় জীবিকার্জনের সাথেও সংশ্লিষ্ট। বরং জীবিকার্জন আশ্রয়স্থল লাভের উপায় এবং তার সহায়ক। সুতরাং দুনিয়া পরকালের কর্মক্ষেত্র এবং তার সিঁড়ি স্বরূপ।

মানুষ তিন প্রকার ঃ এক, যে সর্বদাই তার শেষ আশ্রয়স্থলকে ভুলে গিয়ে জীবিকার্জনে ব্যস্ত। সে ধ্বংস প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য দ্বিতীয় জন, যে জীবিকার্জন ছেড়ে দিয়ে আখেরাতের জন্য ব্যস্ত সেও সফলকামীদের মধ্যে গণ্য। তবে সঠিক পন্থার কাছাকাছি হল তৃতীয় ব্যক্তি, যে আখেরাত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জীবিকার্জনে নিয়োজিত। সে উত্তম উপার্জনকারী। আর যে ব্যক্তি জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করবে সে কখনই অর্থনৈতিক মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না, এবং আখেরাত লাভের উপায় হিসেবে দুনিয়া অন্বেষণে সফলকাম হতে পারবে না যদি না দুনিয়া অন্বেষণে সে ইসলামী শরীয়ার শিষ্টাচার অনুরসণ করে।

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন, মানুষ যদি নিজকে চিনতে পারতো, তার প্রভুকে চিনতে পারতো এবং দুনিয়ার হিকমত ও রহস্য সম্পর্কে জানতো তাহলে সে বুঝতে পারতো যে, এই সকল জাগতিক বিষয় যাকে আমরা দুনিয়া নামে অভিহিত করেছি তা সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র ঐ জন্তুটির খাদ্য হিসেবে যার পিঠে সওয়ার হয়ে আল্লাহর পথে ভ্রমণ করা যায়। আমি জন্তুটি বলতে মানুষের দেহ বুঝাচ্ছি, কেননা সে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র এবং বাসস্থান ছাড়া বাঁচতে পারেনা। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি নিজকে এবং নিজের উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়েছে সে ঐ হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির মতই যে রাস্তায় বিশ্রামের জন্য অবতরণ করে আর তার উটকে খাদ্য, পানীয় যোগাতেই শুধু ব্যস্ত থাকে, তার পরিচর্যা করে, তাকে রঙ বেরঙের কাপড় পরিধান করায় এবং বিভিন্ন ধরনের খাবার তার সামনে হাজির করে, ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে হজ্জের কাফেলা তাকে ছেড়ে চলে যায়, সে হজ্জের কথাও সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় এবং বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে একাকী রয়ে গেলে নিজের জীবনে এবং উটের জীবনে হিংস্র পশুর আক্রমনে কি ভয়াবহ পরিনতির সৃষ্টি হতে পারে সেকথাও ভুলে যায়। অন্যদিকে বিচক্ষণ হাজী উটের প্রতি শুধু ঐ পরিমাণ গুরুত্বই আরোপ করে যাতে উট হজ্জের পথে চলতে পারে। অতঃপর সে তার পরিচর্যা করে বটে কিন্তু তার অন্তর থাকে পবিত্র কা'বা ও হজ্জের দিকে, আর সে উটের প্রতি প্রয়োজন পরিমাণ যত্ন নেয়। অনুরূপভাবে পরকালের পথে ভ্রমণকারী বিচক্ষণ ব্যক্তি শরীরের প্রয়োজন পরিমান পরিচর্যা করে যেমন প্রয়োজন না হলে টয়লেটে প্রবেশ করে না। পেটে খাদ্য প্রবেশ করানো আর পেট থেকে তা নির্গত করানোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয়টাই পেটের প্রয়োজনের তাকিদেই হয়ে থাকে এবং তার গুরুত্ব হল পেটে যা প্রবেশ করে তার মূল্য হল পেট থেকে যা নির্গত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহর পথ থেকে যে বস্তুটি মানুষকে দূরে রাখে তা হল পেট। কেননা মানুষের নিকট খাদ্যই বেশী প্রয়োজন, বাসস্থান ও বস্ত্র অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যদি এসব বিষয়ের প্রয়োজন কেন তা জানতো এবং ঐ পর্যন্তই প্রয়োজন বলে মনে করতো তাহলে দুনিয়ার ব্যস্ততা তাদেরকে অতলে ডুবিয়ে দিতে পারতোনা।

প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা, দুনিয়ার রহস্য এবং দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণই তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু তারা অজ্ঞ ও অলস। দুনিয়ার ব্যস্ততা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছে। তাদের মনের উপর তা অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তারা দুনিয়ার আসল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।
তিনি আরো বলেছেন, 'নিন্দা কিংবা প্রশংসা লাভের পর কেউই সম্পদ আহরণে ডুবে থেকো না যদি না সম্পদের রহস্য, উদ্দেশ্য, বিপদাপদ ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত হতে না পার। আর প্রয়োজন পরিমান সম্পদ লাভে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হল পরকালের শান্তি অর্জন করা যা স্থায়ী নিয়ামত ও চির আশ্রয়স্থল। যারা জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান তাদের প্রধান লক্ষও এটাই। কেননা একবার রসূলে করীম স. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, 'যে মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে এবং তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।' আর এই সৌভাগ্য দুনিয়ায় ৩টি জিনিস ছাড়া অর্জন করা যায়না। সেগুলো হল, মানুষের ব্যক্তিগত গুনাবলী, যেমন বিদ্যা-বুদ্ধি, সৎচরিত্র এবং দেহের উৎকর্ষতা। যেমন-সুন্দর ও সুস্থ দেহ। অন্যটি হল, দেহের বাইরের উৎকর্ষতা। যেমন ধন সম্পদ লাভ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে প্রথম হল মন, তারপর দেহ, তারপর দেহের বাহির। নফস (মন) হল সর্বাধিক মূল্যবান। তার জন্যই মূলত সকল সুখ শান্তি কাম্য। নফসের উৎকর্ষতা লাভের জন্যই মানুষ বিদ্যা, জ্ঞান, উন্নত চরিত্র ইত্যাদি অর্জন করে। এর জন্যই দেহ খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে। আর নফস ব্যবহার করে দেহকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়কে। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে বাঁচিয়ে রাখা, বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ বিস্তার করা, আর শরীরের উদ্দেশ্য হল নফসকে পূর্ণতা দান, তাকে পবিত্র করা, জ্ঞান বুদ্ধি ও চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। যে ব্যক্তি এসব বিষয়ের রহস্য বুঝতে পেরেছে সে ধন সম্পদের মূল্য ও কদর্যতাও বুঝতে পেরেছে। সে বুঝতে পেরেছে অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজন হল দেহকে সুস্থ রাখা আর দেহের প্রয়োজন হল নফসের পূর্ণতা লাভ। যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উপকারিতা, লক্ষ উদ্দেশ সম্পর্কে জানতে পারল, তাকে ঐ উদ্দেশ্য লাভের জন্য ব্যবহার করল, সে অবশ্যই উত্তম কাজ করল এবং তা থেকে উপকৃত হল। আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা জানতে পারল তা তার জন্য প্রশংসনীয়ও হল। ধন সম্পদ হল মূলত মানুষের সঠিক ও নির্ভুল উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ও হাতিয়ার। কেউ এই হাতিয়ার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্যও ব্যবহার করতে পারে। তবে তা হবে পরকালের শান্তি লাভের পরিপন্থি। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করছে সে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা বশত তার ক্ষতিকর দিকটিই গ্রহণ করছে। এ ছাড়াও তার উপর মারেফাত তথা আত্মজ্ঞান ও ইবাদতের জন্য ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আছে। আর এর জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও নিরাপত্তা। এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অর্জনের নিশ্চয়তা ছাড়া দীন পালন করা অসম্ভব।

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবু সাঈদ

অনুবাদক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ৪ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ৪ ৩৭-৫৪

ফিক্‌হের মূলনীতি ও ব্যাপক নিয়ম

মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

ফিক্‌হের পরিভাষায় মূলনীতিকে 'উসূল' এবং ব্যাপক নিয়মকে 'কুল্লীয়াত' বলা হয়। ইসলামের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ যথেষ্ট পরিমাণে এই ব্যাপক নিয়মের (কুল্লিয়াত) সাহায্য নিয়েছেন। এ ধরনের নিয়ম বা গুণগুলো আইনগত প্রবচনে পরিণত হয়েছে। আমরা এ গুণগুলোকে 'প্রবচন' আখ্যায় আখ্যায়িত করবো।

প্রবচন ৪ এক

المشقة تجلب التيسير.

'কষ্টসাধ্যতা সহজতর বিধান আকর্ষণ করার চাহিদা সৃষ্টি করে।'

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান, যা কঠিন তা চান না।'[১]

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

'আল্লাহ চান তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[২]

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا.

'আল্লাহ কারো ওপর তার ক্ষমতার বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।'[৩]

ইহুদী ও খৃস্টানদের জন্যও যে রসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়াত ছিল রহমত স্বরূপ, এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ৪

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَغْلاَلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

লেখক ৪ পাকিস্তানের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম। ওআইসির কেন্দ্রীয় ফিকহ একাডেমীর সদস্য।

'এবং আল্লাহর রসূল নামিয়ে দিচ্ছেন তাদের সেই বোঝা এবং সেই জিঞ্জির যা তাদের ওপর (জগদ্দল পাথরের মতো) চেপে ছিল।'
আয়াতে যে বোঝা ও জিঞ্জিরের কথা বলা হয়েছে তার কিছুটা দীনের ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সীমাহীন বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহ তাদের ওপর চাপিয়েছিলেন আর বাকিটা চাপিয়েছিল তাদের ধর্মীয় নেতা ও যাজক পুরোহিতরা। غلوا فى الدين তথা ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে তাদের মন-মগজ স্থবির হয়ে যায় এবং তারা একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে ধর্ম তাদের কাছে জগদ্দল পাথরের মতো গুরুভার বোঝায় পরিণত হয়। ইসলামী শরীয়তে এসব বোঝা থেকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা ছিল এবং নবী স. এসব বোঝা নামিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

ان الدين يسر ولن يشادَّ الدين احدُ الاَّ غَلَبَهُ.

'দীন অবশ্যই সহজ। কেউ তার মধ্যে অযথা কষাকষি করলে দীন অবশ্যই তাকে পরাস্ত করবে।'[৪]
মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করাকে নবুওয়তের অংশ গণ্য করে তিনি বলেন ঃ

الاقتصاد جزء من خمس وعشرين جزء من النبوة.

'মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।'[৫]

আলোচ্য مشقة বা কষ্ট-এর অর্থ

এক্ষেত্রে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে, ফকীহগণ প্রত্যেকটি কষ্টকে আলোচ্য 'মুশাক্কাত'-এর মধ্যে শামিল করেননি। তারা হাল্কা ও সহজ করে দেয়াকে এত বেশি ব্যাপকতা দান করেননি যে মানুষ যখন ইচ্ছা নিজের মনমতো একটা সহজ পথ বেছে নেবে বরং এরও একটা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর হিকমতও মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেয়ার পক্ষপাতি নয়, যাতে আরামপ্রিয় ও অদূরদর্শী লোকদের হাতে দীন খেলনায় পরিণত হয়ে যায়।
শরীয়তের লক্ষ হচ্ছে, মানুষ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করবে, কামনা ও বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করার সাহস ও শক্তি লাভ করবে।
একথা সুস্পষ্ট, এসব গুণের সমাবেশ মানুষের জীবনে তখনই ঘটতে পারে যখন তার জৈব প্রকৃতির ওপর নৈতিক বিধি নিষেধ আরোপিত হবে এবং গ্রহণ ও বর্জনের নৈতিক ও আইনগত বিধানের আওতাধীনে সে জীবন যাপন করবে।

এছাড়া মানুষের জীবন গড়ে উঠতে পারে না এবং একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এটা কেমন করে সম্ভব, ইন্দ্রিয় লালসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিধি বিধান ও আইন কানুন নির্ধারণ করা হবে এবং সেখানে মানুষ মামুলি শ্রম ও কষ্টও বরদাশত করবে না? তাছাড়া একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় যেমন পার হতে হবে তেমনি আবার আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনার ওপর বিধি নিষেধ আরোপের ক্ষেত্রেও সর্বত্র সহজ ও নরম নীতি অবলম্বনের পথও উন্মুক্ত থাকতে হবে। কষ্ট ও পরিশ্রমের ব্যাপারে, বলা যেতে পারে, মানুষের জীবনের কোনো বিভাগই কিছুটা 'মুশাক্কাত' এর আওতা বহির্ভূত নয়। এমন কি আহার বিহার ইত্যাদি জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারগুলোও কষ্ট ও শ্রমমুক্ত নয়। এ কারণে ফকীহগণ বলেন,

فاحوال الانسان كلها كلفة فى هذه الدار فى اكله وشربه وسائر تصرفاته ولكن جعل الله قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهرة لاان تكون هوقهر تصرفات.

'এই দুনিয়ার জীবনে মানুষের সমস্ত অবস্থাই কষ্টসাধ্য। এমনকি তার পানাহার এবং অন্য সমস্ত কর্মও শ্রমমুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে সব কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং যাতে সে তার কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন না হয়ে পড়ে।'[৬]

এ অবস্থায় শরীয়তের বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে কষ্টও শ্রমকে পুরোপুরি বাদ দেয়া কেমন করে সম্ভব? প্রত্যেকটি মামুলি কষ্ট ও শ্রমের ক্ষেত্রে সহজ ও হালকা নীতি অবলম্বনের সুযোগ দেবার দাবি করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

দুনিয়ার কোনো কাজই কষ্টমুক্ত নয়

একথা পরিষ্কার জেনে রাখা উচিত, ফকীহগণ প্রত্যেকটি কষ্ট ও পরিশ্রমকে আলোচ্য মুশাক্কাত তথা কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে গণ্য করেননি এবং সহজ ও হালকা করার নীতিকেও এত বেশী ব্যাপকতা দান করেননি যার ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সময় তার পথ বের করে নিতে পারে।

পার্থিব সংগ্রামের ক্ষেত্রে মানুষকে যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য কমপক্ষে ততটুকু কষ্ট অপরিহার্য বিবেচনা করা ছাড়া উপায়

নেই বরং একটি বিশেষ পরিমাণ কষ্ট সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি বজায় রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

কাজেই যারা দৈহিক পরিশ্রম ও কষ্টের কাজ করে না তারাও নিজেদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক কাঠামো অটুট রাখার জন্য সামান্য ও প্রয়োজনীয় কষ্ট ও দৈহিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। নয়তো তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। এভাবে দেখা যায় কষ্ট ও পরিশ্রমের বেশ একটা অংশ মানুষের জীবনের সাথে অপরিহার্যভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। মানুষ একে কোনো ক্রমেই বাদ দিয়ে চলতে পারে না। আবার এর একটি অংশকে গ্রহণ না করলে জীবন যুদ্ধে তার পক্ষে টিকে থাকাও সম্ভব নয়। এই দু'ধরনের কষ্টকে 'মুশাককাত'-এর পরিবর্তে 'মেহনত' বলাই ভালো। ফকীহগণের পরিভাষায় একে অভ্যাস সংশ্লিষ্ট কষ্ট বলা হয়। শরীয়তে এ দু'ধরনের কষ্টের ব্যাপারে প্রধানত কোনো 'রুখসাত' বা সহজ ব্যবস্থার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু যে কষ্ট অভ্যাসের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করার মতো নয় অথবা যার পরিমাণ এত বেশী যে জীবনকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তা কল্যাণকর হবার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় তার মধ্যে অবশ্যই রুখসাত তথা হালকা ও সহজ করার পথ বের করতে হবে। ফকীহগণ একে অনভ্যাসযুক্ত অথবা অভ্যাস বহির্ভূত কষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। ফিকহের কিতাবগুলোতে এ দু'ধরনের কষ্টের পরিচিতি এবং পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

ان كان العمل يودى الدوام عليه الى الانقطاع عنه وعن بعضه والى وقوع خلل فى صاحبه فى نفسه اوماله او حال فى احواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد وان لم يكن فيها شئى من ذلك فى الغالب فلا يعده فى العادة مشقة.

'(যে ধরনের কাজে মুশাক্কাত-এর দরুণ 'তাইসী'র অর্থাৎ সহজসাধ্য বিধানের প্রয়োজন পড়ে) সে কর্মটি এমন—যদি তা সর্বক্ষণ করা হয় তাহলে কর্মীর জানমালের ক্ষতি হয় অথবা তার অবস্থায় কোনো না কোনো বিরূপ পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে সে কাজটি সম্পূর্ণ বা আংশিক করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের মুশাক্কাতকে অভ্যস্ত কষ্ট বহির্ভূত মনে করা হবে (এবং এতে 'তাইসীর' প্রয়োজন হবে) আর যে মুশককাতে উপরোক্ত কোনো অবস্থার উদ্ভব প্রায়ই হয় না ফকীহগণ তাকে তাদের পরিভাষাগত মুশাক্কাত বলে গণ্য করেন না।'[৭]

মুশাক্কাত বা কষ্টের প্রকারভেদ

উসূল ও ফিক্হবিদগণ মুশাক্কাতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

এক, প্রকৃত মুশাক্কাত

দুই, কাল্পনিক বা খেয়ালী (وهمى) মুশাক্কাত।

প্রথমোক্ত মুশাক্কাত সহজতর বিধানের 'কারণ' রূপে গণ্য। এই কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) সফর, (২) রোগ, (৩) ইকরাহ বা বলপ্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তি, (৪) নিস্য়ান বা বিস্মৃতি, (৫) জাহ্ল বা অজ্ঞতা, (৬) উসর বা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হওয়া, (৭) উমুমুল বাল্ওয়া বা দুর্বিপাকের ব্যাপকতা, (৮) নুক্স বা প্রকৃতিগত অক্ষমতা, (৯) জুনুদ বা উন্মাদনা, (১০) গাশী বা সংজ্ঞাহীনতা, (১১) নউম বা নিদ্রা, (১২) সিগ্র বা অল্পবয়স ইত্যাদি।

প্রকৃত কষ্টের একটি দৃষ্টান্ত ঃ একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এখনো জানে না রমযানের রোযা রাখলে তার কি পরিমাণ মুশাক্কাত বা কষ্ট হয়। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসকের অভিমতের ভিত্তিতে সে রোযা ভাংতে পারে। যেহেতু রোগীর জন্য শরীয়তে রুখসাত-এর অবকাশ রয়েছে তাই এ ধরনের রোগীকে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হবে।

ফকীহগণ রুখসাত বা সহজতর বিধান দানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাই উল্লেখিত উদাহরণেও তাদের বিধানের আসল রূপ হচ্ছে, প্রথমে রোগীকে রোযা রেখে দেখতে হবে। যদি অসহ্য হয়, তাহলেই রুখ্সাত-এর আশ্রয় নিতে হবে। অবশ্য বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে অথবা ডাক্তারের পরামর্শেও রুখ্সাতের আশ্রয় নেয়া যাবে। কারণ 'ইল্লাত' তথা কার্যকারণ (রোগ) পাওয়া যাওয়ার কারণে হুকুম স্থিত হয়।

খেয়ালী বা কাল্পনিক মুশাক্কাত

শরীয়ত প্রণেতা যেসব কারণ ও ইল্লাতের (কার্যকারণ) ওপর নির্ভর করে রুখ্সাত ও সহজ করার অনুমতি দিয়েছেন সেগুলো অভ্যাসগতভাবে বিদ্যমান আছে কিন্তু বর্তমানে পাওয়া যায় না এমন অবস্থায় তার ওপর নির্ভর করা যাবে না এবং সে কারণে রুখ্সাত ও সহজ করার অনুমতিও দেয়া যাবে না। যেমন, এক ব্যক্তি পালাজ্বরে (এক দু'দিন বিরতি সহকারে একদিন কিছুক্ষণ) ভোগে। পালার দিন জ্বর শুরু না হওয়া পর্যন্ত সে রুখ্সাত লাভের অধিকারী হবে না। তেমনিভাবে

মেয়েদের ঋতু শুরু হবার নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ঋতু শুরু না হওয়া পর্যন্ত তারা রুখ্‌সাত লাভের অধিকারী গণ্য হবে না। মোটকথা এই ধরনের বিষয়গুলোতে শুধুমাত্র অভ্যাসগতভাবে ইল্লাত বর্তমান থাকাটাই যথেষ্ট হবে না বরং তার সশরীরে উপস্থিত থাকাটাই জরুরি। কারণ অনেক সময় অভ্যাস বিরোধী কাজ হতে থাকে এবং অভ্যাস বদলায়ও। যদি একে ভিত্তি বানিয়ে নেয়া হয়, তাহলে বিধানের ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা কায়েম রাখা যাবে না। আর এই নিয়ম শৃংখলাই শরীয়তের প্রাণ।

কষ্টের স্তর বিন্যাস

ফকীহগণ কষ্টের স্তর বিভাগও করেছেন। এরি ভিত্তিতে তারা রুখ্‌সাত ও সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যেমন,

(১) এর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, কোনো হুকুমের ওপর আমল করতে গিয়ে মানুষকে এত বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে যে, তার ফলে শরীরের কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা প্রাণ সংহার হয়েছে। অথবা যেসব মুনাফা অর্জনের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়েছে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

(২) এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, হুকুমের ওপর আমল করতে গেলে মামুলি ও হালকা ধরনের কষ্ট হয়। মাথায় বা কোনো অঙ্গে সামান্য যন্ত্রণা হবার আশংকা থাকে। অথবা মেজাজে হালকা ধরনের প্রভাব পড়ার ভয় থাকে।

(৩) মাঝারি স্তর হচ্ছে, হুকুমের ওপর আমল করতে গেলে এমন পর্যায়ের কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে হয় যা উপরোক্ত দুটি স্তরের মাঝামাঝি ধরনের। যেমন, রোগগ্রস্ত অবস্থায় রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যাবার অথবা দেরীতে রোগ নিরাময় হবার আশঙ্কা থাকে।

এই তিনটি স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ ও মাঝারি স্তর দুটিতে রুখ্‌সাত ও সহজ করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। সর্বনিম্ন স্তরে রুখ্‌সাতের অবকাশ নেই। কারণ অভ্যস্ত বিষয়গুলোতে সামান্য পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তা দূরও হয়ে যায়। আর এর ফলে যে ধরনের হালকা ক্ষতি হয় তা রোধ করার চাইতে বরং হুকুমের ওপর আমল করায় যে কল্যাণ লাভ করা যায় তা লাভ করাটাই উত্তম প্রমাণিত হবে।৮

কষ্টের ব্যবহারে সীমা নির্দেশ ও বিধি নিষেধ

ফকীহগণ মুশাক্কাত বা কষ্টের ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে রুখসাত ও সহজ করার অনুমতি লাভের মধ্যে সীমা নির্দেশ ও বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। এর ফলে

বাহানাবাজ ও স্বেচ্ছাচারী লোকেরা অপাত্রে বা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে এর ব্যবহারে সক্ষম হবে না। যেমন,

যে হুকুমটির ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকবে তার মধ্যে উল্লেখিত নীতি চলবে না। আর যেখানে এই সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকবে না এবং প্রকৃত প্রয়োজনও থাকবে সেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজন পরিমাণেই এই নীতি ব্যবহার করা হবে।

المشقة والحرج انما يعتبر فى موضع لانص فيه اما مع النص يخلافه فلا يعتبر.

'মুশাক্কাত ও হারাজ (সংকীর্ণতা) কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই বিবেচ্য হবে যেক্ষেত্রে সেবিবেচনার বিরুদ্ধে কোনো নস (কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল) থাকে না। যদি থাকে তাহলে বিবেচ্য হবে না।'[৯]

আসলে বিধিবিধান রচনার ক্ষেত্রে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে তা হচ্ছে, তার মাধ্যমে উপকার হবে এবং ক্ষতিকারক দূরীভূত হবে। দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত মহান সত্তার পক্ষ থেকে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষণ হতে পারে সাধারণ বস্তুবাদী দৃষ্টিশক্তি তা কল্পনাও করতে পারে না। অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে একটি জিনিস মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও তমদ্দুনিক জীবনের জন্য বড়ই কল্যাণকর ও উপযোগী মনে হয় কিন্তু ফলাফলের দৃষ্টিতে গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে তার মধ্যে এমন সব ক্ষতিকারক নিহিত থাকতে দেখা যায় যার আমরা চিন্তাও করতে পারি না। অনুরূপভাবে বাহ্যত একটি জিনিস ক্ষতিকর ও অর্থহীন মনে হয় কিন্তু আসলে তার মধ্যে অনেকগুলো কল্যাণ, ফায়দা ও স্বার্থ নিহিত থাকে যেগুলো আমরা জানতে পারি না। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এই মূলনীতির প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّلَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ.

'তোমাদের জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে অথচ তোমাদের তাতে অনীহা। কিন্তু সম্ভবত যাতে তোমাদের অনীহা তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এবং সম্ভবত যা

তোমরা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।'[১০]

আপাতদৃষ্টিতে যুদ্ধ ও রক্তপাত খারাপ কাজ। এতে নিজের মৃত্যুরও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কোনো কোনো অবস্থায় যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন এছাড়া জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় না এবং অনিষ্টকারিতার মূল্যোৎপাটনও সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া কখনো ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্যও যুদ্ধের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রগুলো অনুধাবন করা এবং তারপর তার আলোকে কর্মপন্থা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। এটা যদি এতই সহজ হতো তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যেমন মানুষকে কর্তৃত্বশীল করা হয়েছে তেমনি এটাকেও তার কর্তৃত্বাধীন করা হতো। এ জন্য অনবরতও ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর নির্দেশ দানের প্রয়োজন দেখা দিতো না এবং দীন ও জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করার দরকারও হতো না। এ কারণে কষ্টের ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে রুখ্সাত ও সহজ করার অনুমতি দানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ও সুক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন। প্রত্যেকে একাজ করতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য হবে না।

মুশাক্‌কাত বা কষ্টের ক্ষেত্রে সর্বত্র ভাবাবেগ নির্ভর হওয়া যাবে না

মুশাক্‌কাতের ব্যাপারে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও আবেগ উৎসারিত ঝোঁকপ্রবণতাকে সর্বক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মনে করা হবে না। কারণ শরীয়তের অন্যতম লক্ষ হচ্ছে মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্বমুক্ত করা। প্রবৃত্তিকে শরীয়তের শৃংখলে আবদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। এর সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহর কয়েকটি বক্তব্য উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ.

'তুমি কি দেখেছো এমন ব্যক্তিকে যে প্রবৃত্তিকে তার মাবূদ বানিয়ে রেখেছে?'[১১]

প্রবৃত্তি ও আবেগ নির্ভর ফায়সালাকে অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ.

'অবশ্যই নফস মন্দ কাজের প্ররোচনা সৃষ্টিতে অত্যন্ত পটু।'[১২]

রসূলুল্লাহ্ স. ঈমানের মানদণ্ড নির্ধারণ করে বলেছেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعالما جئت به.

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি (অর্থাৎ শরীয়ত) তার অনুবর্তী না হবে।' তাই ফকীহগণ বলেন ঃ

ان قصد الشارع من وضع الشرائع أخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها فلا تعتبر فى شرعية الرخصة بالنسبة الى كل من شربت نفسه امراء.

'শরীয়ত প্রণয়নের মাধ্যমে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও আচার-আচরণের শৃংখলমুক্ত করা। তাই রুখ্‌সাত তথা সহজতর বিধান দানের ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি চালিত বিষয় বিবেচ্য হবে না।'[১৩]
তাঁরা আরো বলেন,

وضع الشريعة على ان تكون اهوأء النفوس تابعة المقصود الشارع فيها.

'প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে শরীয়তের অধীন করার উদ্দেশ্যেই শরীয়ত প্রণয়ন করা হয়েছে।'[১৪]

শরীয়ত প্রণেতা আবেগ ও প্রবৃত্তিকে এক পর্যায় পর্যন্ত গ্রাহ্য করেছেন

শরীয়ত আবেগ-অনুভূতি ও প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি ও সর্বত্র অগ্রাহ্য করেছে, একথা ঠিক নয়। বরং কল্যাণ লাভ ও ক্ষতির হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য যেসব ক্ষেত্রে আবেগ ও প্রবৃত্তির বিবেচনা জরুরি ছিল শরীয়ত প্রণেতা খুঁটে খুঁটে সেক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে সেগুলো পুরোপুরি বিবেচনা করেছেন। এমনকি অনেক বিষয়ে মূলনীতির প্রতিকূলেও তা করা হয়েছে।
ফকীহগণ এই সুবিধা প্রদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন,

وقدوسّع الله تعالى على العباد فى شهواتهم واحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضى الى مفسدة ولا يحصل بها المكلف على مشقة ولا ينقطع بها منه التمتع اذا اخذه على الوجه المحدود له فلذلك شرع له ابتدء رخصة السلم والقراض والمساقاة

وغير ذلك مماهو توسعة عليه وان كان فيه مانع فى قاعدة اخرى.

'মহান আল্লাহ মানুষের কামনা বাসনা, তার বিভিন্ন অবস্থায়, তার সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তাঁর বিবেচনাকে এমন প্রশস্ত করেছেন যার ফলে মানুষ কোনো ক্ষতি বা (অযথা) কষ্টের সম্মুখীন হয় না। তার সুখ সমৃদ্ধির পথও রুদ্ধ হয় না। অবশ্য সে সমৃদ্ধি হবে শরীয়ত নির্ধারিত পরিধির মধ্যে। এ কারণে শুরুতে রুখ্‌সাত-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাইয়ে সলম (بيع سلم) ও কিরাদ (قراض) তথা যথাক্রমে ধারে বিক্রয় ও লাভের অংশ প্রাপ্তির শর্তে কর্জ দেয়া-এর ব্যাপারে এবং শরীকানা জমি চাষ (مسا قات)-এর ক্ষেত্রে ইত্যাদি, এ সবই শরীয়তের প্রশস্ততা স্বরূপ, যদিও অন্য নিয়ম (কিয়াস) অনুযায়ী এই রুখ্‌সাতে বাধা রয়েছে।'

কষ্টের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য বিপদ গ্রাহ্য নয়

উল্লেখিত কষ্ট ব্যবহারের জন্য সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য বিপদ আঁতিপাতি করে খুঁজে বের করে আনা অথবা নেকী ও পরহেজগারীর ধারণায় বা আত্ম অহমিকায় মামুলি ধরনের ক্ষতির আশংকা করে বড় ধরনের ক্ষতি গ্রহণ করে নেয়া উপরন্তু রুখ্‌সাত ও সহজ করার পথ তৈরি করার জন্য নিছক সম্ভাবনা ও আশা পোষণ করার বিষয়টি গ্রাহ্য করা ইত্যাদি সঠিক নয়।

আসলে মনে যখন ইখ্‌লাস ও সত্যনিষ্ঠা সৃষ্টি না হয় এবং সেখানে বাইরের প্রভাবের প্রাধান্য সৃষ্টি হয় তখন সাদামাটা আইন কানুন ও বিধানের মধ্যে নানা ধরনের জটিলতা ও বাধা বিপত্তি দেখা যায়। এহেন অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন টালবাহানা করে আত্মরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে। বরং অনেক সময় নেকী ও পরহেজগারীর চিন্তাকে নেকী ও পরহেজগারীর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে। কুরআনে এই ধরনের সমস্ত কথার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ وَلاَ تَفْتِنِّىْ اَلاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا.

'তাদের মধ্যে কেউ বলে, আমাকে অনুমতি দিন (যাতে তাবুকের জিহাদে যোগ দিতে না হয়) এবং আমাকে (ঐ অঞ্চলের সুন্দরী নারীদের) ফিতনায় ফেলবেন না। মনে রেখো এরা আসলে ফিতনার মধ্যে পড়েই গেছে।'[১৫]

গ্রীষ্মের খরতাপে বিশাল মরুঅঞ্চল অতিক্রম করে সুদূর তাবূকে গিয়ে জিহাদ করা অবশ্যই বিরাট মুশাক্কাত ও কষ্টের ব্যাপার। আসলে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে রসূল স. রুখ্সাত দিয়েছেন অবশ্যই। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তি রুখ্সাত চাচ্ছেন একটি সম্ভাব্য মুশাক্কাত-এর অজুহাতে। আর তা হচ্ছে সুন্দরীদের ফাঁদে পড়ে তার চরিত্র দূষণের ভয়। এই ধরনের নিছক কাল্পনিক ও অনুমান ভিত্তিক কথায় এবং মামুলি ধরনের কষ্টের কারণে আইন কানুন ও বিধি বিধানকে পাশ কাটিয়ে চলা এবং কাজের কষ্টের ও কাল্পনিক ভয়ের কারণে আমরা ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবো বলে মনে করা নিজেই একটি বড় ফিতনা এবং নফসের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে একটি সম্ভাব্য مشقة-এর অজুহাত। আর তা হচ্ছে সুন্দরীদের ফাঁদে পড়ে তার চরিত্র দূষণের ভয়। এই মুশাক্কাত সম্ভাব্য, বাস্তব বা অবশ্যম্ভাবী নয়, আসলে যা ছিল অজুহাত মাত্র, সুতরাং লোকটি রুখ্সাত দাবি করতে পারে না সম্ভাব্য পরিণতির বিবেচনায়।

এবং কাজের কষ্টের কারণে আমরা ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবো বলে মনে করা নিজেই একটি বড় ফিত্না ও নফসের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ.

'যারা জিহাদে শরীক হয়নি তারা আল্লাহর রসূলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘরে বসে থাকায় খুশী। নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তারা লোকদের বলেছিল, এই গরমের মধ্যে রওয়ানা হয়ো না।" (আত তওবা ঃ ৮১)

সত্য পথে চলায় এবং সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। তাই এই ধরনের প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে রুখসাত ও সহজ করার সুযোগ চাওয়া এবং আত্মপ্রতারণায় মনতুষ্টি লাভ করা সত্যনিষ্ঠা নয়। দীনের কথা না হয় বাদই দিলাম, দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ কারবার করার জন্য মানুষকে কত রকমের কষ্ট সহ্য করতে হয়। এহেন অবস্থায় কষ্ট ছাড়া দীন অর্জন কেমন করে সম্ভব?

হালকা ও সহজ করার আর একটি রূপ

ফিকহের বিধানসমূহ হালকা ও সহজ করার আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে, আইন-কানুন ও বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ শুরুতে মন-মানসিকতাকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে ধীরে ধীরে আইন ও বিধান গ্রহণ করার যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। একবার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেলে মন আপনাআপনিই তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে।

একথা সবাই জানে, দুনিয়ার কোনো আইন ও ব্যবস্থা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যায় না। বরং তা ভিতর থেকে উৎসারিত হয় এবং নিজের স্থান নিজেই তৈরি করে নেয়। অনুরূপভাবে জীবনে একই সঙ্গে তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বরং মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও পরিবেশ অনুকূল করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কেমন করে আশা করা যেতে পারে, দুনিয়ার কোনো জাতি ও দল কোনো নতুন আইন ও ব্যবস্থার নাম শুনতেই নিজের স্বভাব-প্রকৃতির কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে এবং সমস্ত পুরানো মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিয়ে একেবারে সাদরে গ্রহণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে অথবা সরকারী ঘোষণা দেবার সাথে সাথেই তা কার্যকর করতে থাকবে?

তেইশ বছর ধরে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়া এবং আইন-বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বভাব-প্রকৃতির দিকে নজর রাখা উপরন্তু প্রত্যেক পদক্ষেপে অবস্থা অনুযায়ী বিধান হালকা ও সহজ করা ইত্যাদি বিষয় এই সাক্ষ্য বহন করে যে, কোনো আদেশকে মনের গহনে স্থান দেবার জন্য পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিই সর্বোত্তম ও সবচাইতে বেশী বিজ্ঞানসম্মত। এই আইন ও বিধানগুলো একই সঙ্গে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলে মানসিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বিধান না করার কারণে বিরাট সংকট ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে অনেক স্বীকৃত সত্যও সন্দেহজনক পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার এমন অনেক বিষয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হবে যেগুলো জীবনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য এবং যেগুলোর সাহায্য ছাড়া কোনো সৎ ও সত্যনিষ্ঠ-সমাজ অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের 'নাসেখ-মানসূখ' নীতি থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ফকীহগণ একে ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ সমাজ জীবনের অবস্থা ও দাবির প্রেক্ষিতে প্রকৃত প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রেখে বিধানের মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা, বিধানকে হালকা করা এবং

তার মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে। হযরত শাহ অলিউল্লাহ র. বলেন ঃ

والثانى ان يكون شئى مظنة مصلحة اومفسدة فيحكم عليه حسب ذلك ثم ياتى زمان لا يكون فيه مظنة بها فيتغير الحكم.

'দ্বিতীয়, নাসেখ-মানসূখ হচ্ছে, কোনো সুবিধাকে সামনে রেখে অথবা কোনো ক্ষতির আশংকায় কোনো হুকুম দেয়া হয় তারপর এমন সময় আসে যেখানে এটি উদ্দেশ্য হিসেবে টিকে থাকে না। সেক্ষেত্রে এই হুকুম বদলে যাবে।'[১৬]

পূর্ববর্তী মনীষীদের যুগে 'নাসেখ মানসূখ' নীতি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

পূর্ববর্তী সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মনীষীদের (সালাফে সালেহীন) যুগে এই 'নাসেখ-মানসূখ' নীতি থেকে যথেষ্ট সাহায্য নেয়া হয়েছে। ফকীহগণও সাময়িক অবস্থা ও সুবিধার ভিত্তিতে 'প্রবর্তক শক্তি'র এত ব্যাপক ক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে অনেক বৈধ বিষয়কেও তা নিষিদ্ধ গণ্য করতে আবার অনেকের প্রবর্তনকেও বিলম্বিত করতে পারে। সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছিল এমন অনেক মাধ্যম ও উপায় উপকরণ এর আওতায় আসতে পারে। কিন্তু যখন সে অবস্থা বর্তমান নেই তখন অনিবার্যভাবে তার মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। যেমন রসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি থেকে এই নীতির ওপর আলোকপাত হয় ঃ 'হাতীম' ছিল কাবা ঘরের একটি অংশ। এটি দীর্ঘকাল থেকে কাবাগৃহের ইমারতের অন্তরভুক্ত ছিল না। এ সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. জাতীয় প্রকৃতি ও মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে একে কাবাগৃহের ইমারতের অন্তরভুক্ত করেননি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে রা. তিনি এর কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ

لو لاحدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على اساس ابراهيم-

'যদি জাতি নতুন নতুন কুফরী থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ না করে থাকতো, তাহলে কাবাঘর ভেঙে 'ইবরাহিমী ভিত্তি'র ওপর তাকে নির্মাণ করতাম (অর্থাৎ হাতীমকে কাবার ইমারতের মধ্যে শামিল করতাম)।[১৭]

আসলে প্রত্যেক যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। আবার তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন-বিধানের মধ্যে পরিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্পদ' ও 'সাংস্কৃতিক বিপদ' এর মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। আল্লাহর হেদায়াতের আলোকেই এই পার্থক্য অনুধাবন করা যেতে পারে। অন্যথায় 'বিপরীত পক্ষে তথাকথিত জীবন কর্পূরের মতো' এই প্রবাদ মৃত্যু প্রমাণিত হবে। আর মানুষ উন্নতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে না জানি কত 'বিপদ'-কে 'সম্পদ' মনে করে তাদেরকে সংস্কৃতির অংশে পরিণত করবে, যার ফলে সেগুলো সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করার পরিবর্তে তার দুশমন হয়ে যাবে।

শরীয়তে হারজ (حرج সংকীর্ণতা) থাকবে না

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এই নীতির ভিত্তি ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

'আল্লাহ দীনের মধ্যে (তোমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক) কোনো সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি।' (আলহাজ্জ - ৭৮)

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ.

আল্লাহ চান না তোমাদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি তবে তিনি তোমাদের পরিচ্ছন্ন করতে চান। (মায়েদা-৬)
এই কারণে ফকীহগণ বলেন ঃ

الحرج مرفوع। অর্থাৎ হারাজ তুলে নেয়া হয়েছে বা রহিত।

হারজের তাৎপর্য
'আরবী ভাষায় 'হারাজ' মানে হচ্ছে ঃ

الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج.

(ঘন সন্নিবেশিত) বৃক্ষাদির মধ্যে حرجة বলতে বোঝায় যা (বৃক্ষাদির জট) থেকে বের হবার উপায় থাকে না।[১৮]

হযরত আয়েশা ঃ রা. হারাজ এর মানে বলেছেন ضيق অর্থাৎ সংকীর্ণতা।[১৯]
ফিকহের গ্রন্থেও তাই বলা হয়েছে ঃ

'হারজের মূল হচ্ছে দীক বা সংকীর্ণতা' ঃ اصل الحرج الضيق [২০]

হযরত আবূ হুরায়রা রা. একবার বিখ্যাত কুরআন ব্যাখ্যাতা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, 'দীনের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই' একথার অর্থ

কি, অথচ অনেক কামনা-বাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, 'সংকীর্ণতা না থাকার মানে হচ্ছে, প্রাচীন জাতিদের জন্য (তাদের অবস্থা অনুযায়ী) যে সব কঠোর বিধান নির্ধারিত হয়েছিল, তেমনি ধরনের কঠোর বিধান এই উম্মতের জন্য নির্ধারিত হয়নি।' 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) আরো বলেন–

انـمـا ذلك سـعـة الاسلام مـاجـعل الله مـن الـتـوبـة والـكفارات.

আল্লাহ যে তওবা (تـوبـة) ও কাফ্ফারার (كفارة) ব্যবস্থা করেছেন, তা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের প্রশস্ততার প্রমাণ স্বরূপ। (سـعـة)-এর বিপরীতার্থক শব্দ (حرجة বা حـرج)[২১]
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রা. এই ব্যাখ্যাগুলো থেকে দুটি কথার প্রকাশ হয় ঃ
(১) দীনের মধ্যে কঠিন (সংকীর্ণতার ধারক) বিধান নেই।
(২) মানবিক দুর্বলতা ও সামাজিক গলদের কারণে যদি কোনো বিধান কঠিন মনে হয় তাহলে তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।[২২]

হযরত ইকরামা রা. হারজ না থাকাকে ইসলামের ব্যাপকতা মনে করেন

বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত ইকরামা র. ইসলামের প্রশস্ততা (سـعـة) এবং (حـرج) সংকীর্ণতা বিহীনতার একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

مَا اَحَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

'আল্লাহ যে দুই দুই, তিন তিন, চার চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন' তা ও শরীয়তে ইসলামে سـعـة -এর প্রমাণ।
ইসলাম চিরকৌমার্য যেমন অনুমোদন করে না, তেমনি চারটির অধিক বিয়েরও অনুমতি দেয় না, অন্যপক্ষে একাধিক বিয়েতে 'আদল (عدل স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কে যথাসাধ্য সমতা রক্ষা)-এর শর্ত আরোপ করে। হিকমতে ইলাহী দীনে এই سـعـة -এর ব্যবস্থা করেছে যাতে কোন মুসলিম বা মুসলিম সমাজ কোন যুগে حـرج-এর সম্মুখীন না হয়।[২৩] ইসলাম বিধবা এবং বিপত্নিকদের বিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছে। বাল্যবিধবাকে বাকী জীবন একলা থাকতে বললে দীনে حـرج-এসে যাবে এবং সমাজে ব্যভিচারের প্রাবল্য হবে।

এই ব্যাপকতাকে প্রবৃত্তির কামনা ও লালসা চরিতার্থ করার মাধ্যমে পরিণত করা যাবে না। অথবা এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে সমতা খতম করার ও অধিকার পরিমাপ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং মানুষ যাতে তার প্রকৃতিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সমতা সৃষ্টি হয় সে জন্য এই ব্যাপকতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আসল জিনিস হচ্ছে জীবনে আদল ও ভারসাম্য এবং সমাজে সমতা সৃষ্টি। এ জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তার ওপর সে বেশী জোর দেয়নি। বরং সে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ ও নিম্ন সীমানা নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় যদি এই অনুমতিকে ব্যবহার করা হয় তাহলে আর জীবনে আদল ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। আর যদি স্থান ও অবস্থা থেকে একে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে তাহলে তা হারজের (সংকীর্ণতা) অবস্থা সৃষ্টি করবে। এর ফলে যৌন ভ্রষ্টতার সৃষ্টি হবে এবং তা সমগ্র সমাজ দেহে পচন ধরাবে।

এই ধরনের বিষয়াবলীতে প্রগতিশীলতায় আতংকিত হয়ে এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে ভীতির চোখে দেখে জীবন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। বরং আসল জিনিস হচ্ছে, অবস্থা ও স্থানের যথাযথ পর্যালোচনা করে স্থান ও কাল নির্ধারণ। তারপর এরি সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিধান যথাযথ স্থানে বসিয়ে দেবার প্রয়োজন।

অবস্থা ও স্থানের সঠিক পর্যালোচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। একে প্রত্যেক যুগের সবচেয়ে কঠিন কাজ মনে করা হয়েছে। এটি অনুধাবন না করে ব্যাপকতা ও সংকীর্ণতার ফায়সালা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

কর্মজীবনে শরীয়তের ভূমিকা পাদরর্শী চিকিৎসকের মতো

প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্মজীবনে আল্লাহর শরীয়তের মর্যাদা এমন একজন পারদর্শী চিকিৎসকের মতো যিনি নাড়ির গতি, রোগীর শরীরের উত্তাপ ও শীতলতা এবং রোগ ও মেজাজের অবস্থা ও ধরন দেখে ঔষধ ও খাদ্য নির্দেশ করে থাকেন। এভাবে ঔষধ ও খাদ্যের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মেজাজের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে এমনভাবে সক্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করা হয় যার ফলে সে নিজেই রোগের মোকাবিলা করতে থাকে।

রোগীর সঠিক রোগ নির্দেশ অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া এই উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বহুতর পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে উত্তাপ ও শীতলতা এবং কোমলতা ও কঠোরতার যথাযথ পরিমাপ করে ঔষধ ও খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সংশোধনী দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সন্দেহ নেই।

فعل الطبيب الرفيق يحمل المر يض على ما فيه صلاحية يحسه حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه حتى اذا استقلت صحته هيأله طسر يقا فى التدبير وسطا لا نقا له فى جمع احواله-

'আল্লাহর শরীয়ত একজন স্নেহশীল চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে। এই শরীয়ত রোগীর অবস্থা, অভ্যাস এবং রোগের শক্তি ও দুর্বলতার চাহিদা অনুযায়ী রোগীকে রোগ নিরাময়ে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি যখন রোগীর স্বাস্থ্য বহাল হয়ে যায় তখন তার জন্য এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ কর্মসূচী নির্দেশ করে যা তার সবধরনের অবস্থার উপযোগী হয়।'[২৪]

অনুবাদ - **আবদুল মান্নান তালিব**

প্রমাণপঞ্জি

১. আল-বাকারা ঃ ১৮-৫

২. আল-নিসা ঃ ২৮

৩. আল-বাকারা ঃ ২৮৬

৪. বুখারী ও মিশকাত, আল-কাস্‌সু ফিল আমল।

৫. আর দাউদ ও মিশকাত, বাবু আল-হাযরু ওয়াত তালীফিন উমূর।

৬. আল-মাওয়াফিকাত নিশশাতবী, ২য় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

৭. আল-মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

৮. আল ইশবাহ ওয়ান নাযাইর, ৫৬ পৃষ্ঠা।

৯. প্রাগুক্ত, ৫৭ পৃষ্ঠা।

১০. আল বাকারা ২১৬।

১১. আল জাসীয়া, ২৩ আয়াত।

১২. ইউসুফ, ৫৩ আয়াত।

১৩. আল-মাওয়াফিকাত, ১ খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

১৪. প্রাগুক্ত, ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

১৫. আত-তাওবা ঃ ৪৯।

১৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১২২ পৃষ্ঠা।

১৭. মুসলিম, প্রথম খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

১৮. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

১৯. তাফসীরে কাশ্‌শাফ, ২৯২ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কবীর, ৩০০ পৃষ্ঠা।

২০. আল-মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

২১. তাফসীরে কবীর, ১২৮ পৃষ্ঠা ফোটনোট।

২২. আল-মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. আল-মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ : ২০০৯
বর্ষ-৫, সংখ্যা-১৭, পৃষ্ঠা : ৫৫-৬৮

ওয়াক্ফ বিধান

মাওলানা ফারুক আহমদ

ওয়াকফের সংজ্ঞা

ওয়াকফের শাব্দিক অর্থ হল কোন জিনিসকে আবদ্ধ রাখা, আটক রাখা এবং দান করা ইত্যাদি।[১] আর শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াকফের সংগা হল ওয়াকফ কারীর মালিকানায় সম্পদ আটক রেখে সম্পদের উপকার অন্যদের খরচের জন্য দান করা।[২]

ইমাম সারাখসী র. ওয়াকফের শরয়ী সংজ্ঞা বর্ণনায় বলেছেন, মালিকানাধীন সম্পদ অন্যের মালিকানা হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকাকে ওয়াকফ বলে।[৩] ইমাম সারাখসী র. মালিকাধীন শব্দ এই জন্য ব্যবহার করেছেন, যাতে করে মালিক বিহীন জিনিস পৃথক হয়ে যায়। কেননা যদি ওয়াকফকর্তা ওয়াকফ করার সময় ওয়াকফকৃত সম্পদের মালিক না থাকে তাহলে তার জন্য তা ওয়াকফ করা জায়েয নয়। যেমন কেউ কারো মালিকাধীন জমি জোরপূর্বক দখল করে ওয়াকফ করে দিল, এই ধরনের ওয়াকফ জায়েজ নয়।[৪]

ওয়াকফকৃত সম্পত্তি অন্যের মালিকানায় না দেয়ার যে প্রতিবন্ধকতার কথা ইমাম সারাখসী উল্লেখ করেছেন, এর ব্যাখ্যায় ড. উবাইদ আল কুবাইসী লিখেছেন, এর অর্থ হলো, ওয়াকফের ক্ষেত্রে মূল সম্পত্তি ওয়াকফ কর্তার মালিকানায়ই থেকে যায়।[৫]

ইমাম বুরহান উদ্দীন মারগিনানী এবং ইমাম নাসাফী র. ইমাম আবু হানীফা র. এর মত এভাবে ব্যক্তি করেন যে, সম্পদ ওয়াকফকারীর মালিকানায় আবদ্ধ করা এবং তার মুনাফা কোন সৎকাজে দান করাকে শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াকফ বলা হয়। ড. কুবাইসী এই সংজ্ঞার ব্যাপারে বলেন, একথা বাধ্যতামূলক নয় এমন ওয়াকফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আরিয়াত অর্থাৎ কর্জ, এতে কোন বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধ নেই।[৬]

কেননা কর্জ দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের স্বত্ব কর্জদাতারই থাকে আর কর্জগ্রহীতা কেবল মুনাফা ভোগ করে।

লেখক : শিক্ষক, আনোয়ারুল উলূম মাদরাসা, পূর্বরামপুরা, ঢাকা।

৬. মুহাম্মদ উবাইদ আল কুবাইসী তানবীরুল আবসার কিতাবের উদ্ধৃতিতে সাহেবাইন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. কে একত্রে সাহেবাইন বলা হয়) এর মত বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, ওয়াকফ হলো কোন সম্পদের স্বত্বে এভাবে আল্লাহর মালিকানা সাব্যস্ত করা যে, ঐ সম্পদের মুনাফা দাতার পছন্দ অনুযায়ী আল্লাহর বান্দারা ভোগ করবে।[৭]

রদ্দুল মুহতার প্রণেতা উল্লেখিত সংজ্ঞায় বলেছেন, ওয়াকফ কৃত সম্পদ আল্লাহর মালিকানাধীন সাব্যস্ত হবে এবং ওয়াকফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে।[৮]

ইসলামী আইন প্রণেতাগণ ওয়াকফের সংজ্ঞায় এ ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, ওয়াকফকৃত সম্পদে উপকার ভোগী কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার থেকে শুধু উপকার ভোগ করতে পারবে। কেননা মূল সম্পদের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ জায়েয নয়, এই জন্য তা বিক্রিও করা যায় না রেহানও রাখা যায় না। হেবা করা যায় না আর মিরাছের ভিত্তিতে বন্টনও করা যায় না।[৯]

উল্লেখিত সংজ্ঞা সমূহের সার কথা হল, শরীয়তের পরিভাষায় কোন বস্তু আল্লাহর মালিকানায় রেখে তার উপকার বা উপযোগকে গরীবদের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণকর খাতে দান করাকে ওয়াকফ বলা হয়।

ইসলাম পূর্বযুগে ওয়াকফ

ইসলাম পূর্ব যুগেও ওয়াকফের প্রমান পাওয়া যায়, যদিওনাকি বাহ্যত তাকে ওয়াকফ নামকরণ করা হয়নি। এর প্রমাণ হল, পূর্বযুগেও বিভিন্ন উপসনালয় বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর একক কোন মালিকানা ছিল না। ওয়াকফের প্রতিচ্ছবিই তার মাঝে প্রতিফলিত হয়।

আদিম যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের সাথে সাথে স্বয়ং মসজিদের ওয়াকফ হওয়ার বিষয়টিও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন বাইতুল্লাহ ও মসজিদে আকসার অস্তিত্ব এক বাস্তব সত্য বিষয়।

ঐ সমস্ত পবিত্র স্থানের মুনাফা এবং সেগুলো ভোগ ব্যবহারের অধিকার একক কোন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত ছিল না।

বরং সকল মানুষই তাতে শরীক ছিল। সুতরাং একথা বলা অর্থহীন হবে না যে ওয়াকফের অস্তিত্ব সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

যেমন এমন কিছু ইসলামী রীতিনীতি আছে যেগুলোর সূচনা রসূল স. এর মুবারক যুগ হতেই শুরু হয়নি বরং তার অস্তিত্ব পূর্বযুগ হতেই বিদ্যমান, যথা ক্রয় বিক্রয়, ইজারা, বিবাহশাদী ইত্যাদি। যেমন আকদ পূর্বযুগ থেকেই চলে আসছে। তবে ইসলাম তাকে পূর্ণতা এবং সুন্দর ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতি দান করেছে, আর কিছু রীতিনীতি বাতলে দিয়েছে এবং হক বাতিলের পার্থক্য করে তাতে সীমা রেখা টেনে দিয়েছে।

মুহাম্মদ আবু যাহরা ওয়াকফের পর্যালোচনা করে লিখেছেন, ইসলাম ওয়াকফকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে। আর ওয়াকফকে শুধু উপসনালয় ও মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং ওয়াকফ সম্পত্তি দরিদ্রদের জন্যও হতে পারে, এবং করজে হাসানার জন্যও ব্যয় করা যায়।[১০]

হাদীসে নববীর আলোকে ওয়াকফ

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রা. খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন?

রসুলুল্লাহ স. বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদকা করতে পার। উমর রা. এটি গরীব আত্মীয় স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদকা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই, তবে এথেকে সঞ্চয় করবে না।[১১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় এলেন তখন মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, হে বানু নাজ্জার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা বলল, এরূপ নয় আল্লাহর কসম! একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা এর মূল্যের আশা রাখি।[১২]

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, উমর রা. খায়বারে কিছু সম্পদ লাভ করেন এবং নবী স.-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদকা করতে পার। তার পর তিনি সেটি অভাবগ্রস্ত মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের মধ্যে সাদকা করে দেন।[১৩]

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর রা. এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি রসূলুল্লাহ সা. তাকে আরোহনের জন্য দিয়েছিলেন,। উমর রা.-কে জানানো হলো যে, ঘোড়াটি সেই ব্যক্তি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছে। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে তা ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তুমি তা ক্রয় করবে না এবং যা সাদকা করে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে নিবে না। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে

না। বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার সহধর্মীনিদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাদকা রূপে বিবেচিত হবে।[১৪]

ওয়াকফের গুরুত্ব

ওয়াকফ পুণ্য লাভের একটি সুন্দরতম উপায়। ইসলামে এটা কেবল বৈধ রীতিই নয় বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম একাজে উৎসাহ প্রদান করে। ওয়াকফ এমন একটি পুণ্যের কাজ যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পসন্দনীয় কাজে ও আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ওয়াকফ হচ্ছে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতা ইনতিকালের পরও তার সে দান মানবতার কল্যাণে বহাল থাকে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটি ছাড়া তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি বিষয় হল, সাদকায়ে জারিয়া, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।[১৫]

ওয়াকফের শর্তাবলী

ওয়াকফ সহীহ্ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত আছে। তন্মধ্যে কতকের সম্পর্ক ওয়াকফকারীর সঙ্গে, কতকের সম্পর্ক ওয়াকফ কর্মের সঙ্গে এবং কতকের সম্পর্ক ওয়াকফ সম্পত্তির সঙ্গে।

ওয়াকফকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলী

১. ওয়াকিফ তথা ওয়াকফকারী সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, পাগল ও শিশুর ওয়াকফ সহীহ্ নয়।

৩. স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া, ক্রীতদাসের ওয়াকফ সহীহ্ নয়। ওয়াকফ সহীহ্ হওয়ার জন্য ওয়াকফকারীর মুসলিম হওয়া শর্ত নয়, সুতরাং কোন অমুসলিম যদি বিধি অনুযায়ী ওয়াকফ করে তবে তা গ্রহণে আপত্তি থাকবে না।

ওয়াকফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী

১. ওয়াকফ হতে হবে এমন কোন পুণ্যকর্মের জন্য যা শরয়ী দৃষ্টিতে সওয়াবের কাজ।

২. ওয়াকফকে এমন কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল করা যাবে না। যেমন, অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ জমি ওয়াকফ।[১৬]

৩. ওয়াকফকালে ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করার শর্ত আরোপ করা যাবে না। যেমন বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াকফ করছি যে যখন ইচ্ছা আমি এটা বিক্রি করে এর অর্থ নিজ কাজে খরচ করতে পারব।

এরূপ শর্তারোপ করলে ওয়াকফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াকফ করলে ওয়াকফ সহীহ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[১৭]

৪. ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, ওয়াকফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। যেমন বলল, আমি এই জমি এই শর্তে ওয়াকফ করছি যে, তিন দিন বিবেচনা করে দেখব এবং ইচ্ছা হলে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করতে পারব, এরূপ করলে ওয়াকফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের জন্য এভাবে ওয়াকফ করে মসজিদ তৈরী করলে ওয়াকফ সহীহ হবে, কিন্তু বিবেচনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ওয়াকফ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য না হওয়া, কাজেই নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য ওয়াকফ করলে তা সহীহ হবে না। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।[১৮]

৬. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াকফ করলে তা সহীহ হবে না। কেননা এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথচ ওয়াকফ স্থায়ী ভাবে হওয়া শর্ত। সুতরাং ওয়াকফ করতে হবে এমন খাতে যা স্থায়ী হয়। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর দৃষ্টিতে এটি শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না। যাদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তাদের ধারা নিঃশেষ হয়ে যাবার পর তা গরিব মিসকিনদের হক পরিগণিত হবে, তারাই তা ভোগ করবে।[১৯]

ওয়াকফ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী

১. ওয়াকফ করার সময় ওয়াকফের বস্তুতে দাতার মালিকানা থাকা শর্ত। কাজেই জবরদখলকৃত জমির ওয়াকফ বৈধ নয়, এমনকি পরবর্তীতে তা কিনে মূল্য পরিশোধ করলেও পূর্বের ওয়াকফ সহীহ হবে না।[২০] তবে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ছাড়া যদি ওয়াকফ করে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত মালিক যদি তা অনুমোদন করে তবে ওয়াকফ বিশুদ্ধ হবে।[২১]

২. ওয়াকফের বস্তু নির্দিষ্ট হতে হবে। কেউ বলল, আমি আমার জমি থেকে ওয়াকফ করলাম কিন্তু কোথাকার কতটুকু জমি তা বলল না; এরূপ ওয়াকফ সহীহ হবে না।[২২] তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ি যা সকলেই চেনে, তার পরিমাণ ও সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াকফ বিশুদ্ধ হবে।[২৩]

৩. ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, ওয়াকফ বস্তু কোন স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি না হওয়া বরং স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে, অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্র শস্ত্র ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. সহ আরও বহু সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ওয়াকফ করে ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সা. তা অনুমোদন করেছিলেন।[২৪]

ওয়াকফ সম্পত্তি কব্জার বিধান

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী র. আল মাবসূত গন্থে বর্ণনা করেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত শুরাইহ, হযরত হাসান বসরী প্রমুখ এ ব্যাপারে একমত ঘোষণা করেন যে, কোন প্রকারের সাদকাই হস্তান্তর না করলে সদকা জায়েয হবে না। এর উপর ভিত্তি করে হানাফী মাজহাব অনুসারীগণ বলেন, ওয়াকফ কব্জা ব্যতীত পরিপূর্ণ হবে না। যেহেতু সাদকাকারী শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাদকা করে এই জন্য মাল নিজের কাছ থেকে বের না করে দিলে সাদকা হয় না।

সাদকা যেহেতু ফকীরদের জন্য হয় আর মাল ফকীরদের হাতে অর্পণ না করলে তারা সে মাল থেকে উপকার লাভ করতে পারে না এই জন্য ওয়াকফ সম্পত্তিতে উপকার ভোগীদের কব্জা দেয়া জরুরি। কারণ কব্জা না দিলে সেই মাল থেকেও উপকৃত হতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মদ ও ইবনে আবি লায়লা র.-এর উক্তিও এই যে, ওয়াকফকারীর ওয়াকফ কৃত সম্পত্তি মুতাওয়াল্লীর নিকট অর্পণ না করলে ওয়াকফ পরিপূর্ণ হয় না।

অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ র. ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ওয়াকফ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য কব্জা জরুরি নয়। ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীকে কব্জা দিলেও মালিকানা পরিবর্তন হয় না, কেননা মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকারীর প্রতিনিধি বিবেচিত হবেন এবং ওয়াকফকারীই মুতাওয়াল্লীকে নির্ধারণ করবেন। আর প্রতিনিধির কব্জা করা মূল মালিকেরই কব্জা করা হয়। অর্থাৎ ওয়াকফকৃত সম্পদ মুতাওয়াল্লীর কব্জায় দেয়ার দ্বারাও মূলত আসল মালিকের কব্জায়ই থাকে।

মুতাওয়াল্লীর কব্জার কারণে যদি ওয়াকফ সহীহ হয় তাহলে মূল মালিকের কব্জায় কেন সহীহ হবে না?

ইমাম মুহাম্মদ র. দলীল দেন, হযরত উমর রা.-এর সম্পদ অর্পণ করার দ্বারা। তিনি নিজ সম্পদ ওয়াকফ করেছেন এবং পরপরই উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা.-এর কব্জায় ঐ সম্পদ অর্পণ করেছেন যাতে করে ওয়াকফটা পরিপূর্ণ হয়।

কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ র. এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন যে, হযরত উমর রা. যে ওয়াকফ সম্পত্তির কব্জা হযরত হাফসার রা হাতে দিয়েছেন এটা ওয়াকফের পরিপূর্ণতার জন্য নয় বরং এই জন্য দিয়েছিলেন যে তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন ভালভাবে ওয়াকফ সম্পত্তির তদারকী করতে পারবেন না তাই তদারকীর জিম্মাদারী তাঁর কন্যা হযরত হাফসা রা.-এর হাতে দিয়েছিলেন।[২৫]

ওয়াকফের জন্য চিরস্থায়ী হওয়া সম্পর্কিত বিধান

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে ওয়াকফ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা চিরস্থায়ী না করে দেবে, কেননা গোলাম আযাদকরণের ন্যায় ওয়াকফের জন্য স্থায়ী হওয়া শর্ত; তাই নির্ধারিত সময়ের জন্য ওয়াকফ করা সহীহ হবে না।

অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ র. ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁর মতে ওয়াকফের মধ্যে যদি এমন শেষ দিক উল্লেখ করে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলেও ওয়াকফ সহীহ হবে।[২৬] তবে উক্ত দিক নিঃশেষ হয়ে যাবার পর তা গরিবের সম্পদ গণ্য হবে। মূল কথা তাঁর মতেও ওয়াকফের মধ্যে স্থায়ীত্ব শর্ত, স্থায়ীত্ব ও অবিচ্ছিন্ন দিকের উল্লেখ আবশ্যক নয়। কাজেই যাদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তাদের ধারা নিঃশেষ হয়ে যাবার পর তা গরীব মিসকিনদের হক পরিগণিত হবে এবং তারাই তা ভোগ করবে।[২৭]

যৌথ সম্পদ ওয়াকফ করা

যৌথ মালিকানাধীন ধন সম্পদ, সকলের মতেই ওয়াকফকে বাধাগ্রস্ত করে না, ওয়াকফ করা যায়। কিন্তু বিভাজন যোগ্য নয় এমন যৌথ সম্পদ ওয়াকফ করা ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে জায়েয নয়। বুখারার মাসায়েখগণ ও এমত গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফাতাওয়া।[২৮]

ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতেও জায়েয। নিকট অতীতের ফকীহগণ এমতের উপর ফাতাওয়া দিয়েছেন এবং এটাই পসন্দনীয় মত। তবে সকল ইমাম এব্যাপারে একমত যে, অবিভক্ত জমীনকে মসজিদ কিংবা কবরস্তান বানিয়ে দেয়া জায়েয নয়।[২৯]

আর যদি কোন বিচারক অবিভক্ত কোন বস্তুর ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন তবে সে নির্দেশ কার্যকর হয়ে যাবে এবং তা ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হবে।[৩০]

আর যে সব বস্তু বন্টনযোগ্য, কোন বিচারক যদি তার ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন তারপর কোন অংশীদার তা বন্টন করে নেয়ার আবেদন করে তবে ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে বাটোয়ারা অনুমোদনযোগ্য হবে না বরং অংশীদারগণ পালা বন্টন করে নিবে। আর ইমাম ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে বন্টন করে দেয়া যাবে।[৩১]

সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি গোটা বস্তু ওয়াকফ করা হয় এবং কোন কোন অংশীদার বা সকল অংশীদার ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করে তবু তা বন্টন করা যাবে না এবং পালা নির্ধারণ ও করা যাবে না।[৩২]

সমগ্র সম্পত্তিকে ওয়াকফ করার পর যদি তাতে অংশীদারীত্ব প্রমাণিত হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে অবশিষ্ট অংশের ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে, কেননা

ওয়াকফের সময় যৌথ মালিকানা বিদ্যমান ছিল, আর যদি নির্দিষ্ট অংশের স্বত্ব প্রমাণিত হয় তবে অবশিষ্ট অংশের ওয়াকফ বাতিল হবে না।

আর যদি কেউ তার সমুদয় সম্পদ ওয়াকফ করে দেয় তার পর তার মধ্যে থেকে অনির্দিষ্ট অধিকাংশ সম্পদে কারো স্বত্ব প্রমাণিত হয় এবং কাজী উক্ত স্বত্ববানের অনুকূলে অধিকাংশের ফায়সালা প্রদান করেন, তবে ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে অবশিষ্ট অর্ধাংশের ওয়াকফ বহাল থাকবে এবং ওয়াকফকারীর এই অধিকার থাকবে যে, সে উক্ত স্বত্ববানের নিকট থেকে নিজের অংশের বাটোয়ারা করে নিবে।[৩৩]

নিজের জন্য ওয়াকফ করা

ওয়াকফকারী যদি নিজ সম্পত্তির আয় নিজের জন্য ওয়াকফ করে তাহলে তা জায়েয হবে। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর উক্তি। এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে।

১. যেমন কেউ বলল, আমি এই সম্পত্তি এই শর্তে ওয়াকফ করছি যে আমি যতদিন বেঁচে থাকব এর আংশিক আয় আমি নিজেই ভোগ করব, আর আমার মৃত্যুর পর দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ হবে। এ সূরত জায়েয।

২. অথবা এমন বলল যে, আমি যতদিন বেচে থাকব এর সম্পূর্ণ আয় আমি নিজে ভোগ করব এরপর গরীবদের হয়ে যাবে, এ পদ্ধতিও জায়েয।[৩৪]

তবে ইমাম মুহাম্মদ র. এই পদ্ধতিতে ওয়াকফ করাকে জায়েয মনে করেন না। তিনি বলেন ওয়াকফ হল নিঃস্বার্থ ভাবে দান করা, যাতে অন্যকে মালিক বানানো হবে, যদি আয়ের কিছু অংশ বা সম্পদ নিজের জন্য শর্ত করে তাহলে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ র. দলীল হিসাবে নবী করীম স. এর হাদীস পেশ করে বলেন, রসূলুল্লাহ স. নিজেই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ফসল ভোগ করেছেন।[৩৫] কাজেই ওয়াকফকারী নিজে ভোগ করার শর্ত আরোপ করলে তা জায়েয হবে।[৩৬]

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, এরূপ ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। কেননা ওয়াকফ করার কারণে ওয়াকফকারীর অধিকার হতে সে সম্পদ চলে গেছে এবং সে সওয়াবের ভাগী হয়েছে। এ অবস্থায় সে সম্পত্তির উৎপন্ন ফসল কিংবা উপকার নিজে ভোগ করার অর্থ সম্পত্তির ওপর মালিকানা স্বত্ব বহাল রাখা; এটা ওয়াকফের পরিপন্থী তাই এরূপ করা জায়েয হবে না। তবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির অভিভাবকত্ব তথা রক্ষণাবেক্ষণ করা ওয়াকফকারীর জন্য জায়েয, একথার উপর সকল ইমাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৩৭]

নিজের সন্তান সন্ততির জন্য ওয়াকফ

নিজের সম্পত্তি পুত্র কন্যা নাতি-নাতনী ও পরবর্তী বংশধরদের জন্য ওয়াকফ করা জায়েয। যদি কেউ তার সম্পত্তি তার সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করে আর ঐসময়

যদি তার ঔরসজাত সন্তান না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে তার ওয়াকফ সম্পত্তির আয় তার পৌত্র পৌত্রীকে দেয়া হবে, যদি পৌত্র পৌত্রী থাকে।

আবার পরে যদি ওয়াকফকারীর কোন ঔরসজাত সন্তান জন্ম নেয় তবে তখন থেকে তা তাকেই প্রদান করা হবে। ওয়াকফকারী যদি বলে আমার এই সম্পত্তি আমার জন্য ওয়াকফ তবে তার ঔরসজাত পুত্র কন্যা সে ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ নিজের সন্তানরাই তা পাবে। নাতি-নাতনীরা নয়। আর সন্তানদের কেউ জীবিত না থাকলে তা দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয় করা হবে।[৩৮]

যদি সন্তানের সঙ্গে সন্তানের সন্তানদের কথাও উল্লেখ করে তবে তারাও এই ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের সন্তানগণ (তৃতীয় প্রজন্ম) অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কিন্তু যদি সন্তান, তার সন্তান ও অন্য সন্তান এভাবে তিন স্তর উল্লেখ করে তবে যতকাল পর্যন্ত তার বংশধারা অব্যাহত থাকবে সে সম্পত্তির আয় তাদের মধ্যেই বন্টন করা হবে। যদি কখনও বংশ বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

যদি সুনির্দিষ্ট কোন সন্তানের কথা না বলে বরং সাধারণভাবে সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করার পর যদি এক সন্তানের মৃত্যু হয়ে যায় তবে তার অংশ জীবিত সন্তানদেরকে দেয়া হবে।

যদি বর্তমান সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করে তবে পরে জন্মগ্রহণকারী সন্তান সে ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৩৯,৪০]

উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াকফ

ওয়াকফকারী যদি মুমূর্ষ অবস্থায় স্বীয় ওয়ারিসদের জন্য কোন সম্পদ ওয়াকফ করে তাহলে এই ওয়াকফ সহীহ হবে না বরং এক্ষেত্রে অসিয়তের বিধান প্রয়োগ হবে আর অসিয়তের শরয়ী বিধান হল ওয়ারিসদের জন্য কোন অসিয়ত করা জায়েয নেই সুতরাং এই ওয়াকফটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া যদি সুস্থ অবস্থায় কোন ওয়ারিসের জন্য নিজ সম্পদ ওয়াকফ করে তা জায়েয।[৪১]

অমুসলিমদের জন্য ওয়াকফ

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করা জায়েয, কেননা তাদেরকে সাদকা দেয়া জায়েয, এবং সওয়াবের কাজ।

যদি কোন মাল কেবল দরিদ্র যিম্মিদের জন্য ওয়াকফকারী ওয়াকফ করে থাকে আর মুসলমানদের কথা না বলে থাকে তাহলে সে সম্পদ থেকে মুসলমানদেরকে কোন কিছু দেয়া যাবে না। আর যদি মুতাওয়াল্লি মুসলমানদেরকে কিছু দিয়ে থাকে তাহলে তার যিম্মায় দিতে হবে।[৪২]

ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর গুণাবলী

ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর জন্য ফকীহগণ নিম্নোক্ত গুণাবলী নির্ধারণ করেছেনঃ

১. সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

৩. বিশ্বস্ত হওয়া

৪. তত্ত্বাবধান কার্য পালনে সক্ষম হওয়া

৫. মুসলমান হওয়া

ইসলামের বিধিবিধানের মুকাল্লাফ হওয়ার জন্য জ্ঞান বোধ থাকা শর্ত। যে ব্যক্তি পাগল হয়ে যায় তার উপর নামায রোযার অপরিহার্যতা থাকে না সুতরাং কিভাবে তার উপর অন্য কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে? কোন পাগল লোককে ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী বানানো যাবে না। যদি কোন ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী পাগল হয়ে যায়, তাহলে তাকে তার কর্তৃত্বের অধিকার হতে অব্যাহতি দেয়া হবে। যদি কোন ব্যক্তি একাধারে একমাস পর্যন্ত পাগল থাকে তাহলে তাকে পাগল বলে গণ্য করা হবে।

আর যদি সে ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার দুই অবস্থা

১. ওয়াকফকারী যদি এমন লোককে মুতাওয়াল্লী বানানোর শর্ত করে থাকে তাহলে দ্বিতীয় বার তাকে মুতাওয়াল্লী বানাবে আর যদি কাজী তাকে মুতাওয়াল্লী বানিয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় বার তাকে আর মুতাওয়াল্লী বানানো হবে না।[৪৩]

অনুরূপ ভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে এ জন্য যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক তো নামায রোযার বিধানেই আদিষ্টিত নয় এই জন্য তাকে ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী বানানো যাবে না। ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীর জন্য বিশ্বস্ত হওয়া ও বিশ্বস্ত থাকা আবশ্যক। যদি মুতাওয়াল্লী বিশ্বস্ত থাকার পর কোন রূপ খিয়ানত করে আর যদি তা প্রমানিত হয় তাহলে সে আর ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী থাকার যোগ্য থাকে না।

তত্ত্বাবধান দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওয়াকফ সম্পত্তি সঠিক ভাবে পরিচালনার যোগ্যতা থাকা। অবশ্য হানাফী মাজহাব অনুযায়ী মুতাওয়াল্লীর ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনার যোগ্যতা থাকা শর্ত।[৪৪]

যেখানে ওয়াকফ করা হয় মুসলমানের জন্য তার মুতাওয়াল্লীও মুসলমান হওয়া কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী, আল্লাহ কখনোই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ বলবেন না। সূরা নিসা ঃ ১৪১। অবশ্য হানাফী মাজহাবে ফকীহগণ মুতাওয়াল্লীর জন্য মুসলমান হওয়াকে শর্ত করেননি।[৪৫]

মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা

ওয়াকফকারী নিজেই ওয়াকফকৃত সম্পদের মুতাওয়াল্লী হওয়া জায়েয এটি জাহেরী মাজহাব। ওয়াকফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত না করলে, সে মুতাওয়াল্লী হবে না। কেননা ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হল, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফ পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে অর্পণ করে দিবে। এইজন্য একবার ওয়াকফ করে দিলে সে মালের উপর ওয়াকফকারীর কর্তৃত্ব থাকে না, এটি ইমাম মুহাম্মদ রা. এর উক্তি।

ওয়াকফকারী অন্যকে মুতাওয়াল্লী বানালে সে মুতাওয়াল্লী হতে পারে, এমতাবস্থায় নিজেকে মুতাওয়াল্লী বানানো অধিক যৌক্তিক।[৪৬] কিছু সংখ্যক আলেমের মত, মসজিদের জন্য ওয়াকফ করলে তাতে মুতাওয়াল্লী বানানো আবশ্যক নয়। কেননা মসজিদ কারও করায়ত্বে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে এই মতের উত্তরে বলা হয় যে, মসজিদের জন্যও মুতাওয়াল্লীর প্রয়োজন রয়েছে। যাতে করে সে মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে এবং দেখাশুনা ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাই ওয়াকফকারী যদি মসজিদের মুতাওয়াল্লীর অধিকার অন্যকে দিয়ে দেয় তাহলে তা জায়েয হবে।[৪৭]

ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব

মুতাওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে কর্মী নিযুক্ত করতে পারে। আর পারিশ্রমিক হবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। ওয়াকফ সম্পত্তির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারে।

মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকৃত মসজিদের আয় ব্যয় হতে পানি বিদ্যুৎ বাবদ খরচ করতে পারে, কেউ যদি মসজিদ নির্মাণের জন্য কোন কিছু প্রদান করে তাহলে মুতাওয়াল্লী এছাড়া ভিন্নকাজে তা খরচ করবে না। মুতাওয়াল্লী অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতিত ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য কোন কিছু ধার করবে না।[৪৮]

ওয়াকফ সম্পত্তি রেহেন রাখা যাবে না

মুতাওয়াল্লী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়াকফের আয় হতে খরচ নিতে পারবে, যদি ওয়াকফকারী মুতাওয়াল্লীর জন্য খরচ নেয়ার অনুমতি দিয়ে থাকে। যেমন হযরত উমর রা. করেছেন, আর অনুমতি না দিয়ে থাকলেও মুতাওয়াল্লী জরুরী প্রয়োজনীয় খরচ নিতে পারবে যেমন হযরত আলী রা. করেছেন। মোট কথা উভয় অবস্থাতেই মুতাওয়াল্লী নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ নিতে পারবে।[৪৯]

ওয়াকফকৃত সম্পদ যদি এমন হয় যে হুবহু তার থেকে উপকৃত হওয়া যায় যেমন, ঘড় বাড়ি; আর যাদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তারা যদি সেখানে বসবাস করতে থাকে, আর যদি তা মেরামতের প্রয়োজন হয় তাহলে মুতাওয়াল্লী তাদেরকে

উঠিয়ে দিয়ে সেই ঘর ভাড়া দিতে পারবে। অতপর সে আয় দ্বারা বাড়ি মেরামত করে পুনরায় তাদেরকে থাকতে দিবে।[৫০]

মুতাওয়াল্লীকে অব্যহতি দান

ওয়াকফকারী যদি নিজেকে মুতাওয়াল্লী বানায় এবং নিজে মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত রাখে আর ওয়াকফ সম্পত্তিতে তার খিয়ানত প্রমাণিত হয় তাহলে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে অব্যাহতি দান করবেন। যাতে করে দরিদ্রদের হক সংরক্ষিত হয়।

নাবালেগ বাচ্চাদের হক সংরক্ষণ করার জন্য তাদের পক্ষে নিয়োগকৃত প্রতিনিধিরা খেয়ানত করলে যেভাবে বিচার বিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারে অনুরূপ এ ক্ষেত্রেও বিচারক মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

যদি ওয়াকফকারী এই শর্তারোপ করে যে রাষ্ট্র প্রধান ও আদালত তাকে মুতাওয়াল্লী পদ হতে অব্যাহতি দিতে পারবে না, তারপরও খিয়ানত পাওয়া গেলে তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা এই শর্ত শরয়ী বিধানের পরিপন্থি সুতরাং তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৫১]

যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকারীর জীবদ্দশায় মারা যায় তাহলে ওয়াকফকারী নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন মুতাওয়াল্লী নির্ধারণ করবে।[৫২] মুতাওয়াল্লী যদি উম্মাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। ওয়াকফ ইসলামী আইনের একটি বিশাল অধ্যায় এটি এতো স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করা কঠিন। বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি দেখা যেদে পারে।[৫৩]

গ্রন্থপঞ্জি

১. সাইয়্যিদ আমীর আলী, আইনুল হিদায়া, কানূনী কুতুবখানা, লাহোর ২য় খণ্ড পৃ. ২৪১
২. ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখসী, আল মাবসূত বৈরুত; দারুল মা'আরিফা-১৯৭৮ খণ্ড ১২ পৃ. ২৭
৩. ইমাম শাসুদ্দীন আস সারাখসী প্রাগুক্ত পৃ. ২৭
৪. মুহাম্মাদ উবাইদ আল কুবাইসী, আহকামে ওয়াকফ ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়া, বাগদাদ ১৯৭৭, খণ্ড ১ম পৃ.৬৬
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. তানবীরুল আবসার খণ্ড ৩য় পৃ. ৪৯৪-৪৯৫
৮. মুহাম্মদ উবাইদ আল কুবাইস, আহকামে ওয়াকফ, প্রাগুক্ত খণ্ড-১ পৃ. ৭৬
৯. আবূ যাহরা, মুহাযারাত ফিল ওয়াকফ, দারুল ফিকির আল আরবী, কায়রো ১৯৭৬ পৃ.৩৯

১০. গোলাম আবদুল হক মুহাম্মাদ, আহকামে ওয়াকফ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান পৃ. ২৪
১১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী ১ম খণ্ড, ঢাকা-হামিদিয়া লাইবেরী, পৃ. ৩৮৮
১২. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৭
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. আবূ ঈসা আততিরমিযী, জামে তিরমিযী, ১ম খণ্ড পৃ. ১৬৫ দেওবন্দ, ভারত
১৬. ফাতওয়া আলমগীরী, মাকতাবায়ে মাজিদিয়া, কোয়েটা পাকিস্তান, ২য় খণ্ড পৃ. ৩৫৫
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. ফাতওয়া আলমগীরী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৬
১৯. আল কুদূরী, মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ইউপি ইন্ডিয়া, পৃ. ১৩৯
২০. ফাতহুল কাদীর ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২০১
২১. প্রাগুক্ত
২২. ফাতওয়া আলমগীরী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৫
২৩. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২১৫
২৪. ফাতওয়া আলমগীরী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৭
২৫. ইমাম শামসুদ্দীন আস সারাখসী, আল মাবসূত খণ্ড ১২, পৃ. ৩৪-৩৫ দারুল মাআরিফ, বাইরুত, ১৯৭৮
২৬. আল কুদূরী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৯
২৭. আল মিসবাহুন নূরী ১ম খণ্ড পৃ. ৩৯০ ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
২৮. আস সিরাজিয়া সূত্র ফাতওয়া আলমগীরী, ২য় খণ্ড পৃ. ৩৬০ মাকতাবায়ে মাজিদিয়া পাকিস্তান।
২৯. ফাতওয়া আলমগীরী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬০
৩০. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬১
৩১. আল খুলাসা সূত্র আলমগীরী প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬১
৩২. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২১৭
৩৩. প্রাগুক্ত
৩৪. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুমাম ফাতহুল কাদীর; ৫ম খণ্ড পৃ. ৫৬ প্রকাশক মোস্তফা মুহাম্মাদ, মিশর।
৩৫. আহকামে ওয়াকফ, গোলাম আব্দুল হক মুহাম্মাদ, পাকিস্তান।
৩৬. আল মিসবাহুন নূরী ১ম খণ্ড পৃ. ১৯২ ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. আলমগীরী ২য় খণ্ড পৃ. ৩৭৩ প্রাগুক্ত
৩৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৫

৪০. প্রাগুক্ত
৪১. আহমদ বিন মুহাম্মদ আশ শরহুস ছগীর ৪র্থ খণ্ড পৃ. ১১০ দারুল মাআরিফ, মিসর ১৯৭৪।
৪২. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুমাম ফাতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড পৃ. ৩৮ প্রাগুক্ত
৪৩. মুহাম্মাদ উবাইদ আল কুবাহসী, আহকামে ওয়াকফ ফিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়া; ২য় খন্ড পৃ. ১৬২ বাগদাদ-১৯৭৭
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. আহকামে ওয়াকফ, গোলাম আবদুল হক, পাকিস্তান পৃ. ৭৫
৪৬. কামাল উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড পৃ. ৪০ প্রকাশক মোস্তফা মুহাম্মদ, মিসর
৪৭. প্রাগুক্ত
৪৮. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুমাম, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৮
৪৯. ইমাম শামসুদ্দীন আস খারাখসী, আল মাবসূত খণ্ড ১২ পৃ. ৩১ দারুল মারিফা বাইরুত ১৯৭৮
৫০. মুহাম্মদ উবাইদ আল কুবাইসী আহকামে ওয়াকফ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়া; পৃ. ১৯৩ বাগদাদ ১৯৭৭
৫১. কামাল উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড পৃ. ৬১ প্রকাশক মোস্তফা মুহাম্মাদ মিসর
৫২. ইমাম শামসুদ্দীন আস সারাখসী, আল মাবসূত খণ্ড ১২ পৃ. ৪৪, দারুল মাআরিফ বাইরুত ১৯৭৮
৫৩. মুহাম্মাদ উবাইদ আল কুবাইসী, আহকামে ওয়াকফ শারীয়াতিল ইসলামিয়া; ১ম খণ্ড পৃ. ১২০ বাগদাদ ১৯৭৭।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯-৭৬

ওয়াকফ, জনকল্যাণ এবং কিছু প্রস্তাব

মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা

'ওয়াকফ' অর্থ স্থির করা বা নির্ধারণ করা বা নিরোধ। ইংরেজীতে বুঝানো হয় grant for religious purpose অর্থাৎ দীনি উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করাই ওয়াকফ।

'ওয়াকফ বলিতে ইসলাম ধর্মীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যেই কোন ধার্মিক, ধর্মসম্বন্ধীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করাকে বুঝাইবে এবং ইহাতে অমুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক পূর্ব বর্ণিত উদ্দেশ্যে অপর যেই কোন দানকেও বুঝাইবে।'[১]

তবে স্মরণাতীত কাল হতে জনকল্যাণে বা দীনি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এরূপ সম্পত্তিও আইনানুসারে ওয়াকফ সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত।

'যদি কোন জমি স্মরণাতীতকাল হইতে ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতে থাকে যথা মসজিদ কিংবা কবরস্তান, তাহা হইলে উহা উৎসর্গীকৃত করার কোন প্রমাণ না থাকিলেও উহাকে ব্যবহার দ্বারা ওয়াকফ হিসাবে ধার্য করা হইবে।'[২]

ইসলামে আল্লাহর পথে (বিভিন্ন খাতে) অকাতরে দান করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ওয়াকফের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

ইসলামী আইন অনুসারে একজন ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া সম্পত্তির ৩/১ অংশ জনকল্যাণ বা যে কোন দীনি উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করতে পারেন। কিংবা এই পরিমাণ সম্পদ নির্দিষ্ট করে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিকে দান করতে বলতে পারেন যাদের জন্য ইসলামে মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট নেই। শেষোক্ত দানকে হেবা বলা হয়। ওয়াকফ বা হেবার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। মৃত্যুর সময় ছাড়াও যেকোন সময় এরূপ দান করা যায়। মৃত্যুর পর বন্টনের জন্য অসিয়ত করলে এ দান ৩/১ অংশের বেশী করা যায় না। তবে অন্য সময় করলে আরো বেশী করা যেতে পারে। কিন্তু এত বেশী করা যাবে না যাতে মীরাসের অধিকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা থাকে। এরূপ হলে ওয়াকফকারী বা ওয়াকিফ গোনাহগার হবেন।

লেখক : স্কুল শিক্ষক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।

ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে সাধারণত নিরোধকৃত সম্পদের ব্যয়ের খাতগুলো বলে দেয়া হয়। কিন্তু হেবার ক্ষেত্রে সাধারণত খাত বলা হয় না। যাকে দান করা হয় তার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার উপর সব ছেড়ে দেয়া হয়।

ইসলামে ওয়াকফের গুরুত্ব

ইসলামী ওয়াকফ আইনের ব্যাপক আলোচনা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে ইসলামে ওয়াকফের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা জরুরী মনে করছি।

ইসলামে আল্লাহর পথে অর্থদান বিষয়টির বাস্তবায়নের জন্য দুইটি নীতি ও প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আখিরাতের চেতনা ও মানবীয় মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ এবং আইনগত প্রক্রিয়া পরিচালনা।

নবম হিজরী পর্যন্ত প্রথমোক্ত পলিসির চর্চার পর আইনগত প্রক্রিয়া জারী করা হয়।

প্রথমোক্ত পলিসির বিশেষ দিকগুলো হলো

ক. দানশীলতাকে আল-কুরআনে[৩] হেদায়েত প্রাপ্তির জন্য শর্ত হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে।

খ. বিভিন্ন আয়াতে[৪] দান না করা বা পরোপকার না করাকে জাহিলী বৈশিষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গ. নবম হিজরীর পূর্বে মাক্কী[৫] ও মাদানী[৬] অসংখ্য আয়াতে যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য তখন যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে হা-মীম আস সাজদার আয়াতদ্বয় (৬৩৭ নং) খুবই তাৎপর্যবহ। 'ধ্বংস হয়েছে মুশরিকরা যারা যাকাত দেয়না'। প্রশ্ন হতে পারে যে মুশরিকরা কেন যাকাত দিবে? আসলে এখানে বুঝানো হয়েছে যে, যাকাত তথা আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থব্যয় মুমিনদের বৈশিষ্ট; মুশরিকদের নয়।

ওয়াকফ ইসলামের মানব কল্যাণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৃত্যুর পর বন্টনের ক্ষেত্রে সম্পদের ৩/১ অংশ পর্যন্ত ওয়াকফ করা যায়। কিছু হাদীসের ভিত্তিতে অনেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ মানবকল্যাণ ও আত্মীয় স্বজনদের (যারা মীরাসের অধিকারী নয় তাদের ক্ষেত্রে) জন্য অসিয়ত করাকে ওয়াজিব মনে করেন।

হযরত আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার আম্মা হঠাৎ করে মারা যান। আমার মনে হয় কথা বলতে পারলে তিনি সদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদকা আদায় করতে পারব? রসূলুল্লাহ স. বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ হতে সাদাকা আদায় কর।"[৮]

সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস বলেন, শেষ হজ্জের বছরে রসূলুল্লাহ স. আমাকে অনেকবার মক্কায় দেখতে এসেছেন। আমি ভীষণ অসুস্থ থাকায় তিনি দেখতে এসেছেন। আমি

রসূলুল্লাহ স.-কে বললাম, আমার শুধু একটি মেয়ে আছে, আর কেউ নেই। আমার সম্পত্তি অঢেল। আমার অসুস্থতা বেড়ে যাচ্ছে। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দাতব্য কাজের জন্য অসিয়ত করে যাব? রসূলুল্লাহ স. বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? রসূলুল্লাহ স. বললেন, না। তারপর বললেন, তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে দাও। যতটুকুই দাও না কেন আল্লাহ তোমাকে পুরস্কার দিবেন। আর তোমার ওয়ারিসদের ভিখারী করে রেখে যেও না, সেটা ভালো নয়।[৯]

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াকফ সম্পদ ব্যবহারের কিছু চিত্র ঃ

প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রসূলের স. যুগেই আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলামের অমীয় ঝর্ণাধারা বাংলায় প্রবেশ করেছে। তবে এখানে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয় ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেকের সময়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির অভিযানের মাধ্যমে, ১২০৩ খৃস্টাব্দে। তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলে রংপুর নামক রাজধানী স্থাপন করেন। তবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল তাঁর শাসনের বাইরে ছিলো। এর শতাব্দীকালেরও বেশ পরে ১৩৩০ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ তোগলোক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাও ও সোনারগাঁও এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯ খৃ.) চট্টগ্রাম জয় করেন। এভাবে পুরো বাংলাদেশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। তবে এর বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রবেশ করে।[১০]

বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৫৫৪ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলা শাসন করেন।[১১] এ সময়ে ওয়াকফ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো তার কিছু চিত্র আমরা পেশ করছি।

'বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ এলাকায় মক্তব, মাদরাসা কায়েম করতেন এবং এসবের ব্যয়ভার বহনের জন্যে প্রভূত ধনসম্পদ ও জমিজমা দান করতেন।'[১২]

'বাংলার প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং তিনি দিল্লী সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেকের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, বিদ্যালয় স্থাপন করেন।'[১৩]

'W. Adam বলেন, রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজের জন্য।(Adam, second report, p. 37)। কসবা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করতো তাদের যাবতীয়

খরচপত্রাদি যথা-বাসস্থান, আহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বই পুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কালি-কলম, প্রসাধন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হতো।'[১৪]

'গোলাম হোসেন তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন যে, মুর্শীদখুলী খাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বীরভূমের আসাদুল্লাহ নামক জনৈক জমিদার তাঁর আয়ের অর্ধাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।'[১৫]

'ধনবান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এ প্রথাও বিদ্যমান ছিলো যে, তাঁরা উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে তাদের সন্তানাদির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র ছাত্রগণও বিনা পয়সায় তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করতে পারতো। পান্ডুয়াতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিলো যে, মুসলিম ভূস্বামীগণ তাঁদের নিজেদের খরচে প্রতিবেশী দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। এমন কোন বিত্তশালী ভূস্বামী অথবা গ্রামপ্রধান ছিলেন না, যিনি উক্ত উদ্দেশ্যের জন্যে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করেননি।'[১৬]

'প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমুদয় ব্যয়ভার একজন ব্যক্তি বহন করতেন, সরাসরিভাবে অথবা দান, ওয়াকফ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে।'[১৭]

'W. Adam এর রিপোর্টে এ কথাও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সেকালে অতি সুলভে এমনকি বলতে গেলে বিনে পয়সায় শিক্ষা লাভ করা যেতো।'[১৮]

'ইংরেজদের আগমনের পর খৃস্টান মিশনারী স্কুলসমূহে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হতো। সেখানে কেউ বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারতো না। কেউ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে তার সন্তানাদীর বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ দেয়া হতো। মুসলমানদের এই যে বিনে পয়সায় অথবা অতি অল্প খরচে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ ছিলো তার একমাত্র কারণ হলো মুসলিম শাসকগণ এবং বিত্তশালী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে অকাতরে ধনসম্পদ, জমিজমা প্রভৃতি দান করতেন।'[১৯]

আমাদের অতীতের ওয়াকফের ইতিহাসের উপর আরো গবেষণা হওয়া অতি জরুরী। আজকে যারা শিক্ষার নামে অসম ব্যবসাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করছেন কিংবা কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির নামে পকেট ভারী করার মেকানিজম পরিচালনা করছেন তাঁদের একটু গভীরভাবে আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। তাঁরা কি জাতির উপকার করছেন? অথবা তাঁদের উপকার কি খারাপ ফলাফল (reaction) মুক্ত? তাঁদের কি আরো উদারতার পরিচয় দেয়া উচিত নয়?

প্রবন্ধের বিষয়ের সাথে জড়িত না হলেও কয়েকটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। একটি অপপ্রচার মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে, বাংলার মুসলমানরা শিক্ষাবিমুখ ছিলো। প্রমাণ স্বরূপ বৃটিশ শাসনামলের মুসলমানদের শিক্ষাচিত্র তুলে ধরা হয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো ঘরের শত্রু বিভীষণদের ঘৃণ্য অন্তর্ঘাতী তৎপরতা ও পলাশীর প্রান্তরে বাংলার মুসলিম শাসনের পতনের পর মুসলমানদের আর্থ সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা সবই

তছনছ করে দেয়া হয়। অতঃপর বেঁচে থাকাই যেখানে ছিলো দূরূহ সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন সম্ভব ছিলো না।

W. W. Hunter তাঁর গ্রন্থে বলেন, '(ইংরেজদের বিজয়ের পর) শত শত প্রাচীন মুসলিম পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। ফলে লাখেরাজ ভূসম্পত্তির দ্বারা মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল তাও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।'[২০]

আরেকটি অপপ্রচারও বেশ জোরালো, তা হলো; মুসলমানরা নাকি ইংরেজী শেখাকে হারাম মনে করতেন। আলেমদের একটি অংশ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এরূপ ফতোয়া দ্বারা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু এটা মূল চিত্র নয়। মূল চিত্র হলো পলিসির মাধ্যমে শুধু ইংরেজী নয় সার্বিক শিক্ষা ক্ষেত্রেই মুসলমানদের অগ্রগতি এমনকি প্রবেশাধিকার রূদ্ধ করা হয়েছিলো। বিশেষত ইংরেজী স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করা ছিলো অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং মুসলমানরা ছিলো দারিদ্র্যে জর্জরিত।

বাংলাদেশের ওয়াকফ ব্যবস্থার বর্তমান সংক্ষিপ্ত চিত্র

১৯৩৪ সালে 'বেঙ্গল ওয়াকফ ত্র্যাক্ট' নামক আইনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান তৎকালীন বাংলার নিবন্ধিত ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশুনা করতো। এর পূর্বে ১৯২৩ সালেও একটি ওয়াকফ আইন ছিলো।

পাকিস্তান আমলে আইনগুলো আরো সংস্কার করে ১৯৬২ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান ওয়াকফ অধ্যাদেশ' নামে ঘোষণা করা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দদ্বয় বাদ দিলেও ওই অধ্যাদেশ দ্বারাই এখনও দেশের সকল তালিকাভুক্ত (নিবন্ধিত) ওয়াকফ সম্পদগুলো দেখাশোনা করা হয়।[২১]

বাংলাদেশের ওয়াকফ প্রশাসন 'ধর্ম মন্ত্রণালয়ের' অধীন একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর সর্বোচ্চ পদের নাম 'ওয়াকফ প্রশাসক'। তিনি সরকারের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা।

বর্তমান ওয়াকফ প্রশাসন সম্পর্কে এখানে কিছু তথ্য পেশ করা হচ্ছে

বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত ওয়াকফ এস্টেটের সংখ্যা ১৯, ৭৩৮ টি।

সর্বশেষ ১৯৮৬ সালের জরিপ অনুযায়ী অনিবন্ধিত ওয়াকফ এস্টেটের সংখ্যা ১, ৫০, ৫৫৩টি।

*** দেশের ওয়াকফ প্রশাসনের অফিস সংখ্যা**

প্রধান কার্যালয়-১

বিভাগীয় কার্যালয়-৪

জেলা কার্যালয়-২৪

সাংগঠনিক কাঠামো

ওয়াকফ প্রশাসক-১

উপ-প্রশাসক-২

সহকারী প্রশাসক-৬

ওয়াকফ পরিদর্শক-১৮
হিসাব পরীক্ষক-১৮
অন্যান্য-৫৪

বিচারাধীন মামলার বিবরণ

মোট বিচারাধীন মামলা-৬০১টি
ওয়াকফ অফিসে-২০১টি
জেলা জজ আদালতে-২৫০টি
সুপ্রীম কোর্ট/হাইকোর্ট ডিভিশনে-১৫০টি

দেশ স্বাধীনের পর থেকে কয়েক বছরের মোট আয় ব্যয়

সাল	মোট আদায়	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়
১৯৭১-৭২	৩,৩০,৯৮৫/=	২,৬৩,৩০২/=
১৯৮০-৮১	১১,৬১,২৫১/=	৯,৩১,৩৫৪/=
১৯৯০-৯১	৫৫,৪২,১২১/=	৩৮,৮০,৭২৫/=
২০০০-০১	১,৩৯,৫৮,২৪৯/=	৯০,০৪,৭৬২/=
২০০৭-০৮	২,৮২,৫৮,৮৫০/=	১,৫৬,৮৩,১০৪/=

পর্যালোচনা ঃ

** দেশের বিপুল পরিমাণ ওয়াকফ এস্টেটের তুলনায় প্রশাসনের অফিস সংখ্যা ও জনশক্তি অতি অল্প।

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কোন প্রকার ওয়াকফ সম্পদের মোট পরিমাণও হিসাব ওয়াকফ দফতরে নেই। অথচ এটা মৌলিক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দেশের বিপুল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পদের চিত্র উপস্থাপন ও ব্যবহারের কার্যকর উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থাকা উচিত।

ওয়াকফ সম্পদ সমূহের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওয়াকফ প্রদান ও এ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনের যে অভূতপূর্ব নজির আমাদের ইতিহাসে রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

২. ওয়াকফ সম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত জরিপ কার্যক্রম, গবেষণা ও কার্যকর পদক্ষেপ পরিচালনা করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিক্ষা বলতে দীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা এরূপ আলাদা কোন ধারণা ইসলামে নেই। কিতাব ও সুন্নাতের ভিত্তিতে দুনিয়ার কার্যাবলী পরিচালনা করাই

দীন। আরএ উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এর সবই দীনি শিক্ষা।

৩. নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় প্রকার ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ রেকর্ডের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. সরকারী ওয়াকফ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের সার্বিক কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতে ওয়াকফ সম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির সারাংশ জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৫. সরকারী ওয়াকফ প্রশাসনের অফিসের সংখ্যা ও জনশক্তি আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

৬. ওয়াকফ আইন ও বিধিমালাকে আরো সুন্দর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬২-র পর ওয়াকফ আইনের আর কোন সংস্কার সম্পন্ন হয়নি।

৭. ওয়াকফ কার্যক্রমের সাথে সুদের সম্পর্ক বন্ধ করতে হবে। কারণ ওয়াকিফ নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করেন। এই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুদকে এড়িয়ে চলাটা তাই আরো অধিক গুরুত্বের দাবীদার।

ওয়াকফ আইন, ১৯৬২-র কোন কোন ধারা ও বিধিমালায় সুদের উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। যেমনঃ 'ধারা-৭২' বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন বিধি, ১৯৭৫-এর 'বিধি-৮' এর ৯-ক, ১১-ক ও খ, ১২-ক, ১৩, ১৮-গ, ১৯-গ ও ঘ ইত্যাদি।

৮. বস্তুবাদ ও বস্তুবাদ প্রভাবিত আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপকার গ্রহণকারীদের মনে সাধারণত দীনতাবোধ সৃষ্টি হয়। তাই এরূপ যৌক্তিক উপস্থাপনা থাকা জরুরী যাতে করে ওয়াকফ হতে উপকৃত ব্যক্তিদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি না হয়। যেমনঃ

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন যে, দুর্বল ও নিঃস্বদের উছিলাতেই স্বচ্ছল ব্যক্তিরা রিযক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।[২২]

এছাড়াও ওয়াকফ সম্পদ দ্বারা মানুষের শুধু তাৎক্ষণিক উপকার সাধন করাই হবে না বরং এই সম্পদকে সুদক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হবে। এতে করে উপকৃত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নিছক দানপ্রাপ্ত অসহায় আদম সন্তান মনে না করে মানব সভ্যতার উন্নয়ন কর্মী বলে ভাবতে পারবেন। আর আমাদের অতীতে এর যথেষ্ট নজির আছে।

শেষ কথা

ওয়াকফ ক্ষেত্রে আমাদের জাতির রয়েছে স্বর্ণালী ইতিহাস। বর্তমান পৃথিবীতেও ওয়াকফ খাতে প্রদত্ত দান দ্বারা বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠছে। আরব মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশসহ দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশও রয়েছে যথেষ্ট ওয়াকফ

সম্পদ। এই সম্পদের পরিমাণ রেকর্ড ও ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের জাতির অগ্রগতিতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সবাই সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাংলাদেশ ওয়াকফ আইন, ১৯৬২; ধারা-১ (১০)।
২. ওয়াকফ বিষয়ক আইন, ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, ২৭ পৃ; নিউ ওয়ার্স বুক কর্পোরেশন, ২য় সংস্করণ-২০০৭।
৩. আল-বালাদ (৮-১৮), আল-লাইন (৫-৭), আল-বাকারা (২-৩)।
৪. মুদ্দাসসির (৪০-৪৪), লাইন (৮-১০), ফাজর (১৭-১৯), মাউন-৭।
৫. আল-মুযযাম্মিল-২০, হামীম আস-সাজদা (৬-৭), রুম-৩৯।
৬. আন-নূর-৫৬, আল-মু'মিনুন-৪।
৭. সীরাতু ইবনে হিশাম-২/৬৪৭, আল-ইসতীয়াব-৪/৩১৩, আনসাবুল আশরাফ-১,৪২৯, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা(৫) মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ [বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর-২০০৩]
৮. বুখারী, মুসলিম।
৯. বুখারী।
১০. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, [১৩-২৪ পৃঃ দৃষ্টব্য] বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ জুন-২০০২।
১১. পূর্বোক্ত সূত্র, ২৪ পৃঃ।
১২. ঐ-১৪১ পৃঃ।
১৩. ঐ-১৪১ পৃঃ।
১৪. পূর্বোক্ত সূত্র-১৪২ পৃ, A. R. Mallik : Br. Policy & the Muslims in Bengali, P. 150.
১৫. Ghulam Hussain : Seiyere-Mutakherin VolIII, P. 63, 69, 70 & 165, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, ১৪২ পৃঃ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (২০০২)।
১৬. Adam, First Report, P. 55; M. Fazlur Rahman: The Bengali Muslims and English Education, P. 6.
১৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস-১৪৩ পৃঃ।
১৮. ঐ।
১৯. M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, P. 11.
২০. W. W. Hul Hunter : The Indian Mussalmans, Bangladesh Edition 1975, p. 167.
২১. ওয়াকফ বিষয়ক আইন-ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া ২১ পৃঃ।
২২. বুখারী, আবু দাউদ, রিয়াদুসসালেহীন-২৭১ ও ২৭২ নং হাদীস।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ৭৭-৮২

ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান

মোঃ নূরুল আমিন

॥ দশ ॥

আগেই বলা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় প্রায় চার বছর মালয়েশিয়া জাপানী দখলে ছিল। এরপর ১৯৪০ সালে ফেডারেশন চুক্তির অধীনে বৃটিশরা পুনরায় এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রতিটি রাজ্যের শাসক তার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি পেলেও বৃটেনের সাথে তার যুদ্ধ-পূর্ব আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৯৪৬ সালে সারাওয়াক এবং সাবাহ বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। এরপর অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট মালয় ফেডারেশন বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং ঐ বছরই দেশটির সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধানে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। ১৯৬৩ সালে সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক এবং সাবাহকে মালয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করে দেশটির নাম মালয়েশিয়া রাখা হয়। তবে ১৯৬৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার সাথে মালয়েশিয়ার যুদ্ধ বাধলে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য শুরু থেকে মালয়েশিয়ার শাসনতন্ত্রে জাতীয় পানি নীতির একটি দিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিদ্যমান আইন ও বিধি

মালয়েশিয়ার পানি সংক্রান্ত যাবতীয় আইন ও বিধি বিধানকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর একটি হচ্ছে ফেডারেল আইন এবং অন্যটি হচ্ছে স্টেট বা রাজ্য পর্যায়ের আইন। ফেডারেল আইনের মধ্যে ১৯৫৭ সালের মালয় রাষ্ট্র সমূহের ফেডারেশন এবং বর্তমান মালয়েশিয়া ফেডারেশন কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে পেরাক, পাহাং, নেগরী সামবিলাং এবং সেলেঙ্গার নিয়ে মালয় ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল এবং বর্তমান মালয়েশিয়া ফেডারেশনে রয়েছে পশ্চিম মালয়েশিয়ার পারলিস, কেদাহ, পেনাং, পেবাক, কেলানতান, ত্রেঙ্গানু, পাহাং, সেলেঙ্গার, নেগরী সামবিলাং মালাক্কা এবং জাহোর। পূর্ব মালয়েশিয়ার সারাওয়াক এবং সাবাহ রাজ্যও বর্তমান ফেডারেশনের অংশ। ফেডারেশন সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন সমূহের মধ্যে রয়েছে ১৪টি আইন বা অধ্যাদেশ। এর মধ্যে The Water Enactment No 9 of 1920, The Water supply

---

লেখক ঃ সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

Enactment, No 3 of 1932, The Irrigation Area Ordinance, No 13 of 1953, The Drainage Works Ordinance No 1 of 1954, The Land Development Ordinance no 20 of 1956, The Land Conservation Act no. 3 of 1960, The faraje Organisation Act no 109 of 1973, The Farmers Organisation Authority Act, no 110 of 1973, The Environmental Quality Act of 1973 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই আইনগুলো ইতোমধ্যে যুগের চাহিদার ভিত্তিতে সংশোধনও করা হয়েছে। অন্য দিকে রাজ্যওয়ারী পানি সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

1. The State of Kedah

The Water supply Enactment, No. 12 of 1951 as amended by Federal Ordinance no 44 of 1955 and by Enactment no 130 of 1960.

2. State of Johore

The Water Enactment, No. 66 of 1935

3. State of Kelantan

The Water supply Enactment, No. 1 of 1952 as amended by Federal Ordinance no 44 of 1955

4. State of Perlis

The Water supply Enactment, No. 2 of 1952 as amended by Federal Ordinance no 44 of 1955

5. State of Terengganu

The Water Enactment, No. 3 of 1954

The Water supply Rules, 1953

6. State of Sarawak

The Water Supply Ordinance, No. 4 of 1954 as amended by Federal Ordinance no 24 of 1958.

The Water supply Regulation of 1954

7. State of Sabah

The Mining Ordinance, No. 20 of 1960

The Water supply ordinance, No. 16 of 1961

The Water supply Regulations of 1961

The Sabah Economic Development Corporation Enactment, no 30 of 1971

পানির মালিকানা

মালয়েশিয়ার ফেডারেল আইন অনুযায়ী খাল, নদী-নালা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয়ের মালিকানা স্বত্ব রাজ্য প্রশাসকের উপর ন্যস্ত। রাজ্য প্রশাসক ইচ্ছা করলে এই স্বত্ব অন্য

কাউকে সম্প্রদান করতে পারেন। মালয়েশীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, দেশটির জাতীয় ভূমি আইনেও (National Land Code) রাজ্য প্রশাসকের উপর সুনির্দিষ্টভাবে সরকারী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় জলাশয়ের মালিকানা স্বত্ব অর্পিত হয়েছে।

পানি স্বত্ব ও পানি ব্যবহারের অধিকার

ক) অধিকার অর্জনের পন্থা ঃ ফেডারেল আইন

এই আইনে পানির প্রাকৃতিক উৎসসমূহ বিশেষ করে নদী নালা স্রোত ধারা প্রভৃতি থেকে পাইপ, ড্রেনসহ বিভিন্ন পন্থায় গৃহস্থালী কাজ কর্ম, শিল্প কারখানা পরিচালনা, ধান চাষ, পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি কাজে পানি ব্যবহারের অধিকারকে লাইসেন্স সাপেক্ষ করা হয়েছে। খালের পানির বেলায়ও একই বিধান প্রযোজ্য। অভ্যন্তরীণ জলাশয় সমূহে মাছ চাষ, পোনা উৎপাদন, মাছ ধরা প্রভৃতি কাজের জন্যও লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। ফেডারেল আইনে মাছের আকার, ওজন ও মাছ ধরার মওসুম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

রাজ্য আইন

রাজ্য পর্যায়ে ফেডারেল আইন ও বিধি বিধান বাস্তবায়নের সংস্থান রেখে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গৃহস্থালী ও পারিবারিক ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক উৎসসমূহ থেকে পানি নেয়ার জন্য রাজ্য আইনে লাইসেন্স এর বিধান রাখা হয়েছে এবং এটা করা হয়েছে ফেডারেল আইনের অনুসরণে (জহোর, কেলানতান, ট্রেঙ্গানু)। আবার কৃষি ও খনিজ কাজে, পানি নেয়ার জন্য যথাক্রমে ট্রেঙ্গানু এবং সাবাহ রাজ্যের আইনেও পারমিট প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। রাজ্য সমূহে মৎস্য আহরণ ও পোনা উৎপাদন স্বতন্ত্র আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

খ) পারমিট ইস্যুকরণ

ফেডারেল আইন

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নদী বা জলাশয়ের পানি কোনও নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য প্রশাসকরা লাইসেন্স ইস্যু করেন। এদের কাউন্সিল প্রশাসক বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে শিল্প কারখানা, পারিবারিক ও গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে কাউন্সিল প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে জেলা কর্মকর্তারা লাইসেন্স ইস্যু করেন।

সেচ কাজে পানি ব্যবহার করতে হলে জেলা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পানি সরবরাহের লাইসেন্স অথবা পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। সকল প্রকার লাইসেন্স পারমিট একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে দেয়া হয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভেদে এসব মেয়াদ ও শর্তের পরিবর্তন হয়। লাইসেন্সের নির্ধারিত ফি প্রত্যেক বছরে একবার পরিশোধ যোগ্য। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নদী বা জলাশয়ের পানি ব্যবহার করতে হলে লাইসেন্স ফি ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয় যা কাউন্সিল প্রশাসক নির্ধারণ করেন।

পানি ব্যবহারের লাইসেন্স বা পারমিট সরকার কোনও প্রকার কারণ প্রদর্শন ছাড়াই যে কোন সময় বাতিল করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সরকারীভাবে বেশ কিছু নিয়ম কানুন অনুসরণ করা হয়। সরকার যদি লাইসেন্স গ্রহিতার কোনও অপরাধ ছাড়া লাইসেন্স বাতিল করেন এবং এর ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন তা হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। আবার শর্তভঙ্গের কারণে অথবা দেনা পরিশোধ না করায় যদি লাইসেন্স বা পারমিট বাতিল করা হয় তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ পান না। শর্তাবলী পূরণের বেলায় কোনও বিরোধ দেখা দিলে এ ব্যাপারে গঠিত আদালতে তার বিচার হয় এবং লাইসেন্স গ্রহিতা তাতে যদি দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তার লাইসেন্স বাতিল হয়। লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধনযোগ্য। লাইসেন্স বাতিল ও তার শর্তাবলী সংশোধনের ক্ষমতা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। লাইসেন্স বা পারমিট অনুযায়ী নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পানি সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে হয় এবং এই কাজ করতে গিয়ে তাদের সরকারী বা হস্তান্তরিত জমিতে প্রবেশ করতে হয়। হস্তান্তরিত জমি যদি বেসরকারী হয় এবং তার কোন ক্ষতি হয় তা হলে তার বৈধ মালিক বা দখলদার ক্ষতি পূরণ প্রাপ্য হন। যে ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত জমি বা সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে লাইসেন্স বা পারমিট ইস্যু ও বাতিলের বিষয়টি রেকর্ডভুক্ত করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব যে রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয় সেই রেজিস্টারেই কালেক্টার বা রেজিস্ট্রার অব টাইটেলস এর এন্ট্রি দিয়ে থাকেন।
মালয়েশিয়া ফেডারেশনের যাবতীয় আইন কানুন ও বিধি বিধান বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকার সমূহের। এ প্রেক্ষিতে রাজ্য আইনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে স্থানীয় অবস্থা ও পরিবেশকে সামনে রেখে ফেডারেল আইনের বাস্তবায়ন সহজীকরণ। এর কতিপয় দৃষ্টান্ত নীচে পেশ করা হলো ঃ

জহোর

ধান চাষ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে পানি ব্যবহারের জন্য এই রাজ্যে ভূমি ও খনি কমিশনার লাইসেন্স প্রদান করেন। অন্যদিকে শিল্প ও গৃহস্থালী এবং অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহারের জন্য কালেক্টর অব ল্যান্ড রেভিনিউ অথবা ষ্টেট সেক্রেটারী কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য যে কোন লাইসেন্সিং কর্মকর্তা লাইসেন্স বা পারমিট ইস্যু করেন। লাইসেন্সের মেয়াদ, শর্তাবলী, ফি সংশোধন অথবা বাতিলের ব্যাপারে ফেডারেল আইন প্রযোজ্য।

কেলান্তান

এই রাজ্যে শিল্প ও গৃহস্থালী চাহিদা পূরণ অথবা অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহারের জন্য রাজ্যের পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে জেলা কর্মকর্তা অনুমোদন করে থাকেন। ষ্টেট সেক্রেটারী এর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।
ধান চাষসহ কৃষি কাজে পানি ব্যবহারের জন্য রাজ্যের পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শক্রমে জেলা কর্মকর্তা লাইসেন্স ইস্যু করেন। তবে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন সাপেক্ষে সেচ প্রকৌশলীই লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন।

লাইসেন্সের মেয়াদ, শর্তাবলী, ফিস প্রভৃতি লাইসেন্সের প্রকারের উপর নির্ভরশীল। লাইসেন্সের রেকর্ড সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক এবং তা সুনির্দিষ্টভাবে আইনে উল্লেখ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক এবং পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকৌশলীর দফতরে যথারীতি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়।
লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন ও তা বাতিলকরণ এবং হস্তান্তরিত জমি বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে রাজ্যের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ফেডারেল আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য। এ ধরনের অবস্থায় ভূমি স্বত্ব যে দফতরে রেকর্ড করা হয় সে দফতরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক একটি অতিরিক্ত নিবন্ধন প্রয়োজন হয়।

ট্রেঙ্গানু

এই রাজ্যের পানি ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় লাইসেন্স ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন সাপেক্ষে ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত কালেক্টর ইস্যু করেন। এই লাইসেন্সে মেয়াদ, উদ্দেশ্য ও শর্তাবলী, ফিস পরিশোধ প্রভৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। লাইসেন্সের শর্তাবলীর সংশোধন, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং হস্তান্তরিত ভূমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল বিষয় ফেডারেল আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই রাজ্যে লাইসেন্স নিবন্ধনের বিষয়টি অনেকটা শিথিল। হস্তান্তরিত সম্পত্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকলেই শুধু নিবন্ধন হয় এবং ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত কালেক্টর বা ভূমি ও খনি কমিশনার এই নিবন্ধনের কাজ করেন।

সাবাহ

নদী, খাঁড়ি, স্রোতধারাসহ বিভিন্ন জলাশয়ের পানি ব্যবহারের জন্য এই রাজ্যে গণপূর্ত বিভাগের পরিচালক লাইসেন্স ইস্যু করেন। লাইসেন্সের মেয়াদ সহ শর্তাবলীও তিনি নির্ধারণ করেন।

অগ্রাধিকারের বিন্যাস

পানির বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে অগ্রাধিকার বিন্যাসের ব্যাপারে মালয়েশিয়ার আইনে সুনির্দিষ্ট কোনও বিধান নেই। তবে ফেডারেল আইনে পানির সংকট দেখা দিলে সরবরাহ এলাকায় বেসরকারী চাহিদার তুলনায় সরকারী চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরবরাহ হ্রাসের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোনও বিধান নেই। কেদাহ, কেলান্তান ও পার্লিস রাজ্যে অগ্রাধিকার বিন্যাসের এই ধারা অনুসরণ করা হয়।

পানির হিতকর ব্যবহার সংক্রান্ত আইন

১. ফেডারেল আইন

গৃহস্থালী এবং পৌর কাজে ব্যবহারের ব্যাপারে মালয়েশিয়ার ফেডারেল আইনে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে এবং বিধান অনুযায়ী পানি সরবরাহ এলাকায় গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক কাজে পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। পৌর এলাকায় গবাদি পশু গোসল করানো, যানবাহন-গাড়ী ঘোড়া ধোয়া মোছা, নার্সারী ও বাগানের গাছপালায় পানি দেয়া, কৃষি জমিতে সেচ

অথবা যে কোন ব্যবসা বাণিজ্য, কল কারখানায় পানি ব্যবহার বাণিজ্যিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ডিক্রির মাধ্যমে পৌর এলাকার অভ্যন্তরে পানি সরবরাহ এলাকা ঘোষণা, নতুন কোনও এলাকা তাতে অন্তর্ভুক্তকরণ অথবা তা থেকে পুরাতন এলাকা বাদও দিতে পারেন। শহর এলাকার ভিতরে অবস্থিত পানি সরবরাহ এলাকাগুলোকে তার বাইরের এলাকাগুলো থেকে ফেডারেল আইনে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। তবে কাউন্সিল প্রশাসকরা ইচ্ছা করলে গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে উভয় এলাকার জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। প্রত্যেকটি সরবরাহ এলাকায় সরকার নির্ধারিত হারে বিল পরিশোধ সাপেক্ষে গৃহস্থালী কাজে প্রত্যেক বাড়িতে পানি সরবরাহ করা সরকারের দায়িত্ব। সরকারী তথা মিউনিসিপাল স্থাপনা থেকে এই পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। একইভাবে রাজ্য প্রকৌশলীর অনুমোদন সাপেক্ষে শহর নগরের গণশৌচাগার এবং গোসলখানাসমূহেও উল্লেখিত স্থাপনাসমূহ থেকে পানি সরবরাহ করার বিধান রয়েছে। শৌচাগার ও গোসলখানাসমূহ ব্যবহারকারীদের টাউন বোর্ড নির্ধারিত হারে এ জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

বেসরকারী খাতে গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে হয়। রাজ্য প্রকৌশলী বা কাউন্সিল প্রশাসকদের নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তে চেয়ারম্যান এসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য পানির সংযোগ প্রদান করেন। বেসরকারী সংযোগের বেলায় একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত পাইপ নেয়া ও অন্যান্য ফিটিংস সরবরাহ করা সরকারের দায়িত্ব; তবে অভ্যন্তরীণ পাইপ ও ফিটিংস-এর ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বহন করতে হয়।

পানি সরবরাহের যাবতীয় কার্যক্রম ষ্টেট কাউন্সিল নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ক্ষেত্রে ফেডারেল আইন ও ষ্টেট আইনের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পানি সরবরাহের সংকট দেখা দিলে বেসরকারী চাহিদার তুলনায় সরকারী চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ষ্টেট কাউন্সিলের নির্দেশনায় ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ারকে সরবরাহ এলাকায় পাইপ স্থাপন ও সংযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পাদন করতে হয়। নতুন পাইপ স্থাপন, পুরাতন পাইপ মেরামত এবং বিদ্যমান স্থাপনা পরিদর্শনের কাজ রাজ্য কর্তৃপক্ষ সম্পাদন করেন। খরা দেখা দিলে, মেরামতের প্রয়োজন হলে অথবা অনিবার্য অন্য কোনও কারণ দেখা দিলে ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার গৃহস্থালী ও পৌর কাজে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারেন। আবার কোনও গ্রাহক যদি বিল পরিশোধ না করেন, পানির অপচয় করেন অথবা সরকারী আইন ও বিধি ভঙ্গ করেন তাহলে তিনি পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন। (চলবে)

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩-১০২

মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান

॥ দুই ॥

আদম ও হাওয়া আ.-এর সৃষ্টির মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। পবিত্র কুরআনে এভাবে আদম আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে, ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।" (সূরা ঃ আলে ইমরান ঃ ৩৩)। এ আয়াতে নবী ও রসূল রূপে নূহ ও ইবরাহীমের সাথে সমপর্যায়ে আদম আ.-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী তার তাফসীরে বলেন, "আল্লাহ তা'আলার এই মনোনয়ন জনিত সম্মানদান, যাকে আমরা 'নবুয়াত' অভিধায় অভিহিত করে থাকি। (তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৬৯ পদটীকা ঃ ৮)
হযরত আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قلت يا رسول الله أرأيت ادم نبيا كان قال نعم نبيا ورسولا يكلم الله قبيلا-

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রসূল! নবীগণের মধ্যে আদম কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, আদম আ. ছিলেন নবী ও রসূল। তাঁর সাথে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন।" (মুসনাদে আহমদ ৫/১৬৬)
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা প্রত্যক্ষভাবে আদম আ.-কে সম্বোধন করে তাঁকে শরীয়ত দান করেছেন। তাতে তিনি তাঁর প্রতি আদেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন। তাঁর জন্য অনেক কিছুকে হালাল এবং অনেক কিছুকে হারাম করেছেন। তাঁর প্রতি

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

কোন রসূল বা বাহক না পাঠিয়ে তিনি নিজেই এ সমস্ত করেছেন। এটাই তাঁর নবুওয়াত বা নবী হওয়ার প্রমাণ।[১৬]

আল-জাযায়েরী আদম আ.-এর রিসালাত সম্পর্কে বলেন ঃ "তিনি যে রসূল ছিলেন এ অভিমতই অগ্রগণ্য।" তিনি এ প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ দলীল পেশ করে বলেন,

(ক) আল্লাহ তা'আলা আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে প্রেরণকালে বলেছেন ঃ

فَامَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎ পথের নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা বাকারা, আয়াত-৩৮) এ আয়াতে هُدًى আল্লাহর নির্দেশনা প্রেরণের কথা বলে তিনি যে নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন সে আশ্বাসই দেয়া হয়েছিল।

(খ) অন্য এক আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে সে কথাটিই বলা হয়েছে এভাবে ঃ

وَعَصىٰ اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى.

"আদম তাঁর রবের হুকুম অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। এর পর তার রব তাঁকে মনোনীত করলেন, তাঁর তওবা কবুল করলেন ও তাঁকে পথ নির্দেশ দান করলেন।" (সূরা ত্বাহা :১২১-১২২)

এই মনোনীত করাই ছিল তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাত দান করা ।

(গ) হযরত আবু সাঈদ খূদরী রা. বর্ণিত হাদীসে রসূল স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমিই হব আদম সন্তানদের তথা সমস্ত মানব জাতীর সরদার। এটা আমার অহংকার নয়। আমার হাতেই থাকবে আল্লাহর প্রশান্তির পতাকা। এটা আমার অহংকার নয়। সে দিন আদম সহ সকল নবীই আমার পতাকাতলে সমবেত থাকবেন।" (মুসনাদে আহমদ খ:৩, পৃ:২)

তাবারীর বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম আ.-কে পৃথিবীর রাজত্ব দান করলেন তখন তিনি তাকে নবুওয়াত দান করলেন এবং তার সন্তানদের প্রতি তাঁকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন।

আল্লাহ তা'আলা আদমের প্রতি একুশ খানা সহীফা অবতীর্ণ করেন। তিনি স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেন।" (তারীখুত্ তাবারী খ: ১ পৃ:১৫০)।

আদম আ.-এর শরীয়ত

সভ্যতার আদিযুগ থেকেই আদম আ.-এর সহীফাগুলো সহ পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী ও রসূলগণের প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ও সহিফা সমূহ বিকৃতি,

বিস্মৃতি ও বিলুপ্তির শিকার হয়েছে। এ জন্যই আদম আ.-এর সময়কার শরীয়ত ও সহিফা গুলোর নির্দেশিত বিধিবিধানের কাঠামো কী ছিল বা তাঁর ইবাদত ও প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থার নমুনা কী ছিল তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এতদসংক্রান্ত বর্ণনা সমূহ হতে কিছু কিছু বিষয় জানা যায়, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো ঃ

হামদ ও সালাম এর ব্যবস্থা

আল্লামা ইবনে কাসীর সহীহ ইবনে হিব্বান থেকে আবু হুরায়রা বর্ণিত একখানা হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করেন এবং তার দেহে রূহ ফুঁকেন তখন তিনি হাঁচি দিয়ে বলে ওঠেন اَلْحَمْدُ لله (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)। তিনি তাঁর আদেশক্রমেই হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা করেন। তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, তোমার রব তোমার প্রতি সদয় হোন হে আদম! অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট ফিরেশতাদের দিকে যাও এবং তাদেরকে সালাম দাও। তখন আদম গিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন। তিনি বললেন, "আস্‌সালমু আলাইকুম" তারা বললেন, "ওয়া'আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ" অতপর তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলেন। তখন তিনি বললেন, এটাই তুমি ও তোমার সন্তানদের মধ্যকার সম্ভাষণ " (ইবনে কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ: ৪৪)। উক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে আদম আ.-এর সর্ব প্রথম ইবাদত ছিল "اَلْحَمْدُ لله" বলে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দরবারে হামদ বা কৃতজ্ঞতাসূচক স্তুতি জানানো। পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে বহুল প্রচলিত সালাম ও তার জবাব দানের শিষ্টাচারপূর্ণ বিধানটিও যে সৃষ্টির সূচনালগ্ন ও মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময় থেকেই আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলে আসছে উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা তাও নিশ্চিত ভাবে জানা গেল।

তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা

শয়তান আদম হাওয়াকে প্রতারণা করে নিষিদ্ধ গাছের ফল আস্বাদন করালো। ফলে তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো জান্নাতের পাতা দিয়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বললেন, "আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ২২) আদম ও হাওয়া তখনই আল্লাহর নাফরমানির জন্য লজ্জিত হলেন ও আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেনঃ আল্লাহর ঘোষণা হল ঃ

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

'তারা দুজন বলে উঠলো, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে নিসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।' (সূরা আল- আ'রাফঃ২৩)

আদম আ. কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ এবং সালাত ও হজ্জ আদায়

আন-নওয়ারী রচিত "তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত" গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ফেরেশতাগণই সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণ করেছিলেন। অতপর হযরত আদম কা'বা নির্মাণ করেন।" আল-বায়হাকী দালাইলুন-নবুওয়া গ্রন্থে মারফু হাদীস বর্ণনা করে বলেন, "রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে আদমও হাওয়ার নিকট প্রেরণ করে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। নির্মাণ শেষে তাদেরকে কা'বা তাওয়াফ করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত নূহ আ. কা'বায় হজ্জ পালন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রায্যাক স্বীয় গ্রন্থ 'আল-মুসান্নাফ' এ বর্ণনা করেছেন, হযরত আদম আ. পাঁচটি পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করে তা দিয়ে কা'বা নির্মাণ করেন। পাহাড়গুলোর নাম হলো লুবনান, তূরে যীতা, তূরে সায়না, আল-জুদী ও হিরা।'

আল-মুহিব্ব আত-তাবারীর ভাষ্য মোতাবেক কা'বার ভিত্তি নির্মাণে হিরা পর্বতের পাথর ব্যবহার করা হয়। হযরত আদম আ.-এর পর তাঁর পুত্র শীছ আ. দ্বিতীয় বার কা'বা নির্মাণে অংশ গ্রহণ করেন। (ইফাবা, ইসলামী বিশ্বকোষ খ. ৭, পৃ. ৩১)

কা'বা নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কিত আলোচনায় পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো,

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

'নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, (মক্কার অপর নাম বাক্কা) তা বরকতময় ও জগতবাসীর জন্য হিদায়াত দানকারী।' (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৬)

এ আয়াতের তাফসীরের সার সংক্ষেপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ শফী র. বলেন, মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত করা হয় তা ঐ গৃহ যা বাক্কা তথা মক্কায় অবস্থিত। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্ব প্রথম গৃহ। এর অর্থ এ ও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম ঘরটি ইবাদত গৃহরূপে নির্মিত হয়েছিল।

এর পূর্বে পৃথিবীতে না কোন ইবাদত গৃহের অস্তিত্ব ছিল, না কোন বাস গৃহের অস্তিত্ব ছিল। হযরত আদম আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর ব্যাপারে এটা অকল্পনীয় নয় যে, আপন বাসগৃহ নির্মাণের পূর্বেই তিনি আল্লাহর ইবাদতের জন্য গৃহ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিবেন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. জাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, কাবাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ। আর এটাও অসম্ভব নয় যে, মানুষের বসবাসের (প্রয়োজনীয়) গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম কাবা গৃহই নির্মিত হয়েছিল। এই শেষোক্ত অভিমতটি হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত হয়েছে।
বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে তাদেরকে কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে তাদেরকে তার তাওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয় এবং বলা হয়, হে আদম! আপনিই পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্ব প্রথম মানব এবং এ ঘরটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ, যা মানব জাতির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১১৪)। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নূহ আ. কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ খানা অক্ষত ছিল। (দ্র. ঐ)

নবী রসূলদের যুগ

আল্লাহর বিধান কার্যকরী করাই ছিল নবী রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ঃ
মহান রাব্বুল 'আলামীন তাঁরই ইবাদত অর্থাৎ তাঁর হুকুম-আহকাম ও বিধি- বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনার জন্যই দুনিয়ায় নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

'আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমিতো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি।' (সূরা নাহল ঃ ৩৬)
দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান তথা তাগুতের চেষ্টা সাধনা সর্বত্রই কার্যকর রয়েছে। তাই, শয়তানের প্রবঞ্চনা বোঝার জন্য নবী রসূলদের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার ফয়সালা করে না তারা তার বিরোধী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ - فَاِنْ تَوَلَّوا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ.

'তুমি আল্লাহর আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কর, এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করো না। সাবধান থাক তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা হেদায়াত হতে এক বিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে। আর এরা যদি বিভ্রান্ত হয় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের কোন কোন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। বস্তুত এদের অনেক লোকই ফাসেক।' (সূরা মায়েদা ঃ ৪৯)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

'আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা কাফের।' (সূরা মায়েদা ঃ ৪৪)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

'আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা জালিম'। (সূরা মায়েদা ঃ ৪৫)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

'আরা যার আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা ফাসেক'। (সূরা মায়েদা ঃ ৪৭)

যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তার নাযিল করা আইন ত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মন গড়া আইনের ভিত্তিতে ফায়সালা করে সে আসলে বড় ধরনের অপরাধ করে, এ কাজটিই পর্যায়ক্রমে কুফরী জুলুম ও ফাসেকী।

এ জন্যেই আল্লাহ যুগে যুগে সকল মানুষের নিকট নবী ও রসূলদের মাধ্যমে তাঁর আইন ও কানুন এবং বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। এই নবী ও রসূলদের সংখ্যা পবিত্র হাদীসে এভাবে এসেছে ঃ

হযরত আবু উসামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হযরত আবূ যার গিফারী রা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল, নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে রসূল হলেন তিনশত পনের জন। একটি বড় দল।' (মিশকাতুল-মাসাবীহ কানপুর, ভারত পৃ. ৫১১) কোন কোন বর্ণনায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারের উল্লেখও পাওয়া যায়। (আন-নাসাফী, শারহুল আকাইদ, পৃ. ১৩১)
পবিত্র কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا.

'আমি প্রেরণ করেছি অনেক রসূল, যাদের কথা পূর্বে আপনাকে বলেছি; এবং অনেক রসূল, যাদের কথা আপনাকে বলিনি' (সূরা আন নিছা ঃ ১৬৪)
পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে মাত্র পঁচিশ জন নবী ও রসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত আদম আ. সর্ব প্রথম নবী ও রসূল এবং হযরত মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল। নবীগণের আলোচনা পর্যায়ক্রমে করা হলো ঃ

হযরত শীছ আ. حضرت شيث عليه السلام

হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি নবুওয়ত প্রাপ্তি ও তাঁর সন্তানদের মাঝে আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করার বিধান দ্বারা মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তী সময় আদম আ.-এর সন্তানদের মধ্য থেকে যে নবী ও রসূলের মাধ্যমে মানব সমাজে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয় হযরত শীছ আ. তাদের মধ্যে প্রথম। পবিত্র কুরআন মজিদে হযরত শীছ আ.-এর নবুয়ত বা অন্য কোন বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। তাঁর নবুয়তের কথা হযরত আবু যার রা. বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায়, যা ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে,

قال أبو ذر فى حديثه عن رسول الله ﷺ إن الله أنزل مائة صحيفة وأربع صحف على شيث خمسين صحيفة -

'আবু যর রা. বলেন যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা একশত চার খানা ছহীফা নাযিল করেছেন, তার মধ্যে পঞ্চাশখানা ছহীফা নাযিল করেছেন শীছের উপর'। (ইবন কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ১, পৃ. ৯১)।
হযরত আদম আ.-এর ইন্তেকালের সময় তিনি স্বীয় পুত্র শীছ আ.-কে নিজের খলীফা মনোনীত করে যান এবং তাঁকে অবহিত করেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর

'শীছ' ই হবে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি ও পৃথিবীর খলীফা। আল্লাহর হক ওয়াসীদের নিকট প্রত্যর্পণকারী এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে যাদের ইন্তেকাল হয় তিনি তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। (আল-মাসউদী, মুরূজুয যাহাব খ. ১, পৃ. ৪৮)।
আদম আ. শীছকে দিবা-রাত্রির হিসাব ও তার প্রতি মুহূর্তের ইবাদত শিক্ষা দেন। পরবর্তীকালে সংঘটিতব্য মহাপ্লাবন সম্পর্কেও তিনি তাকে অবহিত করেন। (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ. ১, পৃ. ৪৩)
হযরত আদম আ.-এর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর ইনতিকালের পর শাসন ক্ষমতা (ও বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব) হযরত শীছ আ.-এর উপর অর্পিত হয়। তিনি জনগণের মাঝে শাসন কার্য (ও বিচার ফয়সাল) পরিচালনা করেন এবং পিতার ও নিজের প্রতি নাযিলকৃত সহীফা অনুযায়ী শরয়ী বিধান চালু করেন। (আল-মাসউদী, মুরূজুয যাহাব, খ. ১, পৃ. ৪৮)।
নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত শীছ আ. নিজের ও কাবীলের বংশধরদের মধ্যে দীনি দাওয়াত ও বিচার ফয়সালার কাজ শুরু করেন। তিনি তাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন এবং নেক কাজের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময় লোকজন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল অনুসরণ ও আনুগত্য করে এবং অপর দল কাবীলের বংশধরদের আনুগত্য করে। কাবীলের বংশধরদের কিছু অংশ শীছ আ.-এর দাওয়াতে সৎ পথ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যরা অবাধ্যতার উপর অটল থাকে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে অগ্নিপূজা করতো যা কাবীলের জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। হযরত শীছ আ.-এর হেদায়াত ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি বলতেন, 'আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করবে। ন্যায়-অন্যায় বিচার করে চলবে। পিতা-মাতাকে সম্মান করবে। তাদের সেবা-শুশ্রূষা করবে। ভ্রাতৃত্বভাব রক্ষা করবে। রিপুর বশীভূত হয়ে ক্রোধকে প্রশ্রয় দিবে না। অভাবগ্রস্ত ও দীন দুঃখীকে মুক্ত হস্তে দান করবে। মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। পাপ কার্য হতে বিরত থাকবে। বিপদাপদ, বিপর্যয় ও দুর্যোগে ধৈর্য ধারণ করবে। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হবে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।' (কাজী এ এফ মফিজ উদ্দীন আহমদ, কাছাছুল কুরআন, পৃ. ৭৭-৭৮)। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশারদ ইবনুল আছীর সুস্পষ্টভাবে এমত ব্যক্ত করে বলেন, হযরত শীছ আ. মক্কায় বসবাস করতেন এবং প্রতি বছর হজ্জ ও উমরা পালন করতেন। (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ. ১, পৃ. ৪৭)। হযরত শীছ আ.-ই প্রথম মাটি ও প্রস্তর দ্বারা কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। কাবাঘর নির্মাণের পূর্বে হযরত আদম আ.-এর জন্য সেখানে একটি তাঁবু ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা তৈরী করেছিলেন। (ইবনু কুতায়বা, আল-মাআরিফ, পৃ. ১২)

ইন্তিকালের সময় শীছ আ. স্বীয় পুত্র আনুশকে ডেকে হিদায়াতের সিলসিলা জারী রাখার জন্য ওসিয়ত করেন। ওসিয়ত অনুযায়ী তিনি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে থাকেন এবং আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক জনগণের মাঝে আইন ও বিচার ব্যবস্থা কার্যকরী করেন। অতঃপর তদীয় পুত্র কীনান, অতঃপর তদীয় পুত্র মাহলাইল উক্ত কাজে তার স্থলাভিষিক্ত হন। কথিত আছে যে, পারস্যবাসীর ধারণা মতে মাহলাইল সাত ইকলীমের বাদশাহ ছিলেন, সকল আদম সন্তানের শাসক ছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম বৃক্ষ কেটে কাঠের ব্যবহার শুরু করেন। তিনিই বিভিন্ন শহর এবং শহরের বাইরে বড় বড় কিল্লা নির্মাণ করেন। তিনিই ছিলেন বাবিল ও সূর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই শয়তানের অনুসারীদেরকে লোকালয় থেকে দূরে তাড়িয়ে দেন। তারা পাহাড় পর্বতে বসবাস করতে থাকে। তিনি একটি মুকুট বানিয়েছিলেন, যা পরিধান করে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি চল্লিশ বছর রাজ্য পরিচালনা করেন। 'মাহলাইলের পর তার পুত্র য়ারুদ এবং তার পর তৎপুত্র আখনুখ তথা ইদরীস আ. এই দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ১, পৃ. ৯৯)
মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময় থেকেই হযরত আদম আ.-এর সন্তানদের মাঝেই আল্লাহ মনোনীত নবী রসূলগণের আবির্ভাব হতে থাকে, যাদের মধ্যে পবিত্র কুরআনে হযরত শীছ আ. সহ মাত্র পঁচিশ জনের নাম উল্লেখিত হয়।

হযরত ইদরীস আ. حضرت إدريس عليه السلام

মানব সভ্যতার প্রাথমিক সিপাহসালারদের মধ্যে মর্যাদাবান একজন নবী ছিলেন হযরত ইদরীস আ.। তিনি মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ত্রিশটি সহীফা প্রাপ্ত হন। পবিত্র কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। সূরা মারয়ামের ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ فِيْ الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ - اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا.

'ইদরীসের উল্লেখ কর এই কিতাবে। তিনি এক সত্যপন্থী ব্যক্তি ও নবী ছিলেন'। উক্ত আয়াতে তাঁকে নবী ও সিদ্দিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে তাঁকে ধৈর্যশীলগণের মধ্যে শামিল করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِسْمَا عِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِيْنَ.

'আর এই (বুদ্ধিমত্তা, রাষ্ট্রশক্তি ও ইলমের) নেয়ামত ইসমাইল, ইদরীস ও যুল কিফলকে দিয়েছি এরা সকলেই ধৈর্যশীল লোক ছিল।' (সূরা আম্বিয়া ৮৫)

হযরত ইদরীসই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আরও আবিষ্কার করেন সেলাই এবং ওজন ও পরিমাপ করার পদ্ধতি। জীবন রক্ষার হাতিয়ার পত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার তাঁর সময় হতেই শুরু হয়। তিনিই সর্ব প্রথম মানব যাঁকে আল্লাহ তা'আলা মুজিযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অংকশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষার দ্বারা তৎকালীন মানব জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথনির্দেশ লাভ করে। যার গোড়াপত্তন হয়েছিল হযরত আদম আ.-এর সময় থেকেই। (রুহুল মা'আনি, খ. ১৬, পৃ. ১০৫)

হযরত আদম ও শীছ আ.-এর পর হযরত ইদরীস আ.-ই সর্বপ্রথম নবী। তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলা ৩০টি সহীফা নাযিল করেন। (যার দ্বারা তিনি তার কওমকে হেদায়াত দান করেন।) তিনিই সর্বপ্রথম মানব যাকে আল্লাহ তা'আলা মু'জিযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অংকশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা দান করেছিলেন। হযরত ইদরীস আ.-ই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লেখার নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং সর্বপ্রথম কাপড় সেলাই করেন। প্রতিবার সূঁই চালাবার সময় তিনি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। তৎকালে তার তুলনায় উত্তম আমলকারী আর কেউ ছিলেন না। (তাফসীর ইবন কাছীর, খ. ২, পৃ. ৪৫)। তিনি সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করেন। তাঁর পূর্ববর্তী লোকেরা জীব-জন্তুর চামড়া পরিধান করত। ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতিও তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও ব্যবহার তার সময় থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র তৈরি করে নাফরমান কাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। (রূহুল মা'আনি, খ. ১৬, পৃ. ১০৫)

মানব সভ্যতার উন্নয়নে হযরত ইদরীসের বৈশিষ্ট্যাবলী

শারীরিক গঠন

হযরত ইদরীস আ.-এর শারীরিক গঠন ছিল একজন নেতার মতই। তিনি গোধুম বর্ণের, মধ্যমাকৃতির, পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট, পাতলা চুল বিশিষ্ট, সুদর্শন এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। তার চেহারা অত্যন্ত সুন্দর, বাহুদ্বয় মজবুত, কাধ প্রশস্ত এবং শরীরের হাড় শক্ত ছিল। তিনি হালকা-পাতলা গড়নের লোক ছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল উজ্জ্বল ও কাল, তিনি ছিলেন কথাবার্তায় ধীরস্থির, নীরবতা প্রিয় ও চালচলনে গাম্ভীর্যপূর্ণ। চলার সময় তিনি দৃষ্টি অবনমিত রাখতেন। তিনি চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ছিলেন এবং রাগের সময় শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা বার বার ইশারা করতেন। তাঁর আংটির উপর নিম্নোক্ত বাক্য অংকিত ছিল ঃ

الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر-

আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে ধৈর্য অবলম্বন বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়। তাঁর কোমরবন্ধের উপর লিখিত ছিল ঃ

الأعيد فى حفظ الفروض والشريعة تمام الدين وتمام الدين لكمال المروة–

মানবতার প্রকৃত ঈদ আল্লাহর অবশ্য কর্তব্যসমূহ আদায় করার মধ্যেই নিহিত, দীনের পূর্ণতা শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট আর মানবতার পূর্ণতাই দীনের পূর্ণতা। তিনি জানাযার নামাযের সময় যে পাগড়ী ব্যবহার করতেন তাতে নিম্নের বাক্যটি লিখিত ছিল ঃ

السعيد من نزل لنفسه وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة–

ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সুপারিশ হলো তার নেক আমলসমূহ। (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৯৮-৯৯)

মানব সভ্যতাকে উন্নতির শিখরে ধাবিত করার যত গুণাবলী প্রয়োজন তার মধ্যে ধৈর্যশীল হওয়া অন্যতম। আর ইদরীস আ. সেগুণের সাথে সাথে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ও সর্বদা নেক আমলকারী ছিলেন। তিনি সভ্যতার পূর্ণতা বিধানকে দীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন বলে তার জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

হযরত ইদরীস আ.-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও দীনের প্রচার

হযরত শীছ আ.-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল। পরে তারা নিজ গোত্রের অপরাপর মুশরিক ও মূর্তি পূজকদের অনুসরণ করে হযরত শীছ আ.-এর মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করতে থাকে। এভাবে যিনি মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকেই পূজা করে জাতির কিছু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে মুশরিকে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য তাদের মধ্য হতে হযরত ইদরীস আ.-কে নবুওয়ত দান করেন এবং তাকে হেদায়েতের প্রতি দাওয়াতের নির্দেশ দান করেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি লোকদেরকে আল্লাহর দীন, একত্ববাদ এবং আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেয়ার ও তার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান। নেক আমলের মাধ্যমে তিনি লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি তাদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা এবং নির্দিষ্ট দিন সমূহের (أيام بيض) এর সওম পালন করার জন্য হুকুম করেন। পার্থিব ধনদৌলত জমা করে বিলাসিতার প্রতি আসক্ত না হওয়া, সব ব্যাপারে আদল ও ইনসাফ কার্যকর করা এবং দুর্বল ও অসহায় লোকদের সাহায্য করার জন্য যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেন। আল্লাহকে সাহায্য করার জন্য যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেন। আল্লাহর

দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য তাঁর সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি জনগণকে নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করা, কুকুর ও শূকর ভক্ষণ না করা এবং মাদক দ্রব্য গ্রহণ না করার ব্যাপারে কঠোর বিধান প্রদান করেন। এমনিভাবে তিনি বিশেষ বিশেষ সময়ে ঈদ তথা আনন্দ উৎসব উদযাপন এবং বিশেষ ধরনের নেক আমল করার জন্য জনগণকে বিশেষভাবে তাকীদ করেন। (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৭)

হযরত ইদরীস আ.-এর হিজরত ও দাওয়াত

মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হযরত ইদরীস আ. নবুওয়ত প্রাপ্তির পর মানব সমাজে আল্লাহর বিধানের দাওয়াত ও দীনের হুকুম আহকাম এবং বিধি বিধান মোতাবেক বিচার ফয়সালা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। ফলে বেশ কিছু লোক দীনের অনুসারী হন ও দীনের বিধান মোতাবেক নিজেদের জীবন ও সমাজ পরিচালনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন। কিন্তু যারা নবীর দাওয়াত মেনে নিতে পারেনি তারা দীনকে চরম ভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং নবী ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধিতা শুরু করে। যার কারণে হযরত ইদরীস আ. নিজ এলাকা ছেড়ে হিজরত করে অন্যত্র চলে যেতে মনস্থ করেন এবং নিজ অনুগামীদেরকেও তাঁর সাথে হিজরত করার নির্দেশ দেন। নও মুসলিমগণ তখন পর্যন্ত দীনের শিক্ষা ও রীতিনীতি পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেনি, ফলে তারা প্রাথমিক অবস্থায় তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করা দুঃসাধ্য মনে করে বললো, 'বাবেল শহরের মত অনুরূপ শহর আমরা কোথায় পাব? ইদরীস আ. তাদেরকে দীনের মূল বিষয় সমূহ সম্পর্কে শিক্ষা দেন ও দুনিয়ায় বিলাসী জীবন যাপনের তুলনায় দীনের বিধি বিধান ও বিচার ফায়সালা মেনে চলার গুরুত্ব এবং তার জন্য উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশে হিজরতের ফলাফল বুঝাতে থাকেন। তিনি তাদেরকে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়ে বলেন যে, আমরা যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করি তবে তিনি অবশ্যই সেখানে আমাদের সম্মানজনক রিযক দান করবেন। শেষে মুসলিম সম্প্রদায় নবীর দাওয়াতে সাড়া দেন। অতঃপর ইদরীস আ. ও তার অনুসারীগণ মিসরের উদ্দেশ্যে বাবেল শহর ত্যাগ করেন। মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদত কার্যকরী করার জন্য ঈমানদার লোকেরা নিজ দেশে বিরোধিতা ও বাধার সম্মুখীন হয়ে নবীর আহ্বানে হিজরত করেন। হিজরতকারীদের এই ক্ষুদ্র দলটি বাবেল শহর থেকে বের হয়ে যখন নীল নদ অববাহিকার সুজলা-সুফলা অঞ্চল দেখতে পেল তখন আনন্দিত হলো এবং এই উৎকৃষ্ট স্থানটিকে নির্বাচন করে নীলনদের পার্শ্বেই বসবাস করতে লাগলো। এখানে পৌঁছে ইদরীস আ. আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবনের সার্বিক বিষয়ে ফয়সালা চালু করার জন্য সৎ কাজের

আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করার সংগ্রামে ব্রতী হলেন। কথিত আছে, তাঁর সমসময়ে বাহাত্তরটি গোত্রে লোকজন বিভক্ত ছিল। তাদের প্রত্যক গোত্রের ভাষা ছিল আলাদা। আল্লাহর অনুগ্রহে হযরত ইদরীস আ. সকল গোত্রের ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ভাষায় দাওয়াত ও শিক্ষা দিতেন এবং তাদের মাঝে দীনের বিধান মোতাবেক ফায়সালা করতেন। (প্রাগুক্ত, কাসাসুল কুরআন খ. ১, পৃ. ৯৪-৯৫)

হযরত ইদরীস আ. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান কার্যকরী করতে বাধা পেয়ে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বাবেল শহর থেকে মিসরে হিজরত করেন। সেখানে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আল্লাহর বিধি বিধান কার্যকরী করা ও পরস্পর দীন মেনে চলার দাওয়াতী প্রোগ্রাম চালু করেন। তিনি ইসলামী বিধান মোতাবেক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন প্রণালী ও দলবদ্ধ জীবনের প্রতি আকর্ষণীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি প্রতি গোত্র থেকে বাছাই করা প্রতিনিধি সংগ্রহ করে তাদেরকে দেশ শাসন ও এ সম্পর্কিত মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেন। প্রতিনিধিগণ উক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ নিজ গোত্রে প্রত্যাবর্তন করে অর্জিত নীতিমালার ভিত্তিতে শহর ও গ্রামগুলোকে আবাদ করেন। তাদের আবাদকৃত শহরের সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশত। এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম শহরের নাম ছিল (رها) রুহা, যার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। শাসন কার্যের শৃঙ্খলার জন্য তিনি তাঁর শাসিত ভূখণ্ডকে চার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি দেশের যাবতীয় হুকুক আহকাম শাসন ব্যবস্থা অর্থ ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা আল্লাহর দীন তথা ইসলাম মোতাবেক কার্যকরী করার নির্দেশ ও ফরমান দিয়েছিলেন। উল্লেখিত চারটি এলাকার শাসনকর্তার নাম ঃ (১) إيلاوس ইলাওয়াস, (২) زوس যুস, (৩) اسقليبوس ইসকিলীবুস ও (৪) زوسامون যূসআমূন।

হযরত ইদরীস আ. শিক্ষার ধরনও পেশার দিক দিয়ে তাঁর দেশের জনগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করে ছিলেন ঃ

(১) জ্যোতিষী, (২) রাজা ও (৩) প্রজা। হযরত ইদরীস আ.-এর দেশে জ্যোতিষীদের মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে ছিল। কেননা তাদেরকে তিনি আল্লাহর দরবারে নিজের ব্যাপারসহ রাজা ও প্রজা সম্প্রদায় সকলের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে বলে তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বশীল হিসেবে আখ্যা দিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে মর্যাদাশালী ছিল রাজা সম্প্রদায়। কেননা তাকে নিজের ও রাজত্বের যাবতীয় কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়াবলী আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তৃতীয় পর্যায়ে ছিল প্রজা সম্প্রদায়। জীবনের সকল

কাজের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে এই শিক্ষা তিনি প্রজাদের দিয়েছিলেন। (প্রাগুক্ত, কাসাসুল কুরআন খ. ১, পৃ. ৯৫-৯৮)
এভাবেই হযরত ইদরীস আ. মহান রাব্বুল আলামীনের দীন মোতাবেক তাঁর অনুসারীদের মাঝে ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় বিষয় ফয়সালা করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার মাধ্যমে বিচার ফয়সালা প্রবর্তন করেন।

হযরত নূহ আ.

দুনিয়ায় মানব সৃষ্টির পর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত নূহ আ. ছিলেন একজন বিশিষ্ট নবী ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁকে 'পরম কৃতজ্ঞ বান্দা' আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّه كَانَ عَبْدًاشَكُوْرًا.

'তোমরা তো সেই লোকদের সন্তান যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম। আর নূহ ছিলেন একজন শোকর গুযার বান্দা।' (সূরা বনী-ইসরাইলঃ৩)। মহান রাব্বুল আলামীন নূহ আ.-কে নবুওয়ত দান করে তার জাতির লোককে হেদায়ত দান করার জন্য ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِه اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. قَالَ يقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. اَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوْهُ وَ اَطِيْعُوْنِ.

'আমি নূহকে তাঁর জাতির প্রতি পাঠিয়েছি (এই নির্দেশ সহকারে) যে, সে তাঁর জাতিকে সাবধান করবে তাদের উপর এক ভয়ানক উৎপীড়ক আযাব আসার পূর্বে। তিনি (নূহ) বললেন ঃ 'হে আমার জাতির জনগণ আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট ভাষার সাবধানকারী (নবী)। তোমাদেরকে সাবধান করছি যে, তোমরা সকলে এক আল্লাহর হুকুম মেনে চল ও আমার আনুগত্য কর।' (সূরা নূহ ঃ ১-৩)। উক্ত সময়ে নূহ জাতির লোকেরা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পরে ব্যাপক ভাবে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয় ও সর্ব প্রকার পাপাচারে ডুবে যায়। তারা বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। মদ্য পান করা ও আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে খেল-তামাশায় মত্ত হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ছিল ঐক্যবদ্ধ। (ইবনুল কাছীর, আল-কামিল, খ. ১, পৃ. ৫৪)।
নবুওয়ত প্রাপ্তির পর হযরত নূহ আ. তাঁর বিভ্রান্ত জাতিকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে লাগলেন, তাদেরকে অন্য সব উপাস্য পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য দাওয়াত দিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلى قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ اِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"আমি নূহকে তার সময়কার লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি, সে বলল 'হে আমার জাতির লোকেরা (এক) আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য কঠিন আযাব দিবসের ভয় করছি।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৯)। তিনি শুধু তাদেরকে শাস্তিরই ভয় দেখালেন না বরং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তাদের জীবনের যাবতীয় কার্য কলাপের ফয়সালা করলে ও তাদের জীবনের সকল ব্যাপারে শুধুমাত্র এক আল্লাহর বিধি বিধান পালন করলে এবং সে ব্যাপারে নবীর দেখানো পথকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করলে তাদের পিছনের কৃত অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেয়ার ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার কথাও বললেন। এ সম্পর্কে তিনি আল্লাহর বাণী দিলেন ঃ

اَنِ اعْبُدُوا للّهَ وَاتَّقُوْهُ وَ اَطِيْعُوْنِ. يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّهِ اِذَا جَاءَ لاَيُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"তোমাদেরকে সাবধান করছি যে, তোমরা সকলে এক আল্লাহর দাসত্ব কর, তা হলে আল্লাহ গুনাহ খাতা মা'ফ করে দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় যখন আসবে তখন আর তা রোধ করা যাবে না, তোমরা যদি জানতে তবে কতই না ভাল হত ।' (সূরা নূহঃ৩-৪)।

তিনি তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার ও সুখ-শান্তি প্রাপ্তির আশ্বাস দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রাকৃতিক নিআমত সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করে আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّه كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا. وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا.

"(নূহ বলেন) আমি বলেছি তোমরা তোমাদের ইলাহের নিকট ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সরঞ্জমাদি দিয়ে ধন্য করেন। তোমাদের জন্য

বাগ- বাগিচা সৃষ্টি করেন। আর তোমাদের জন্য ঝর্ণা ও খাল প্রবাহিত করেন। (সূরা নূহ;১০-১২)। অতঃপর জাতির লোকদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে তাদের কার্যাবলি কি হওয়া উচিৎ তা বুঝিয়ে দিলেন; বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ,তিনিই যে সকল শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টি থেকে যাবতীয় আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী তা বুঝিয়ে বললেন-

مَـا لَكُمْ لاَ تَرْجُـوْنَ لِلّهِ وَقَـارًا. وَ قَـدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا. اَلَمْ تَـرَوْا كَيْـفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمٰوتٍ طِبَاقًا. وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. وَ اللّهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا. ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا. وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا. لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না? অথচ তিনিই তো তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি লক্ষ করনি, আল্লাহ কিভাবে আকাশ মন্ডলীকে সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত করেছেন এবং সেখানে চন্দ্রকে আলোক রূপে ও সূর্যকে প্রদীপ রূপে স্থাপন করেছেন ? তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।' (সূরা নূহ ঃ ১৩-২০)
হযরত নূহ আ.-এর জাতি তাঁর দাওয়াতী আহ্বানের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো। তারা বললো ঃ

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرٰكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ.

'জবাবে তাঁর জাতির সরদার লোকেরা যারা তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করলো তারা বললো, আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু দেখছি না; আমরা তো দেখছি তোমার অনুসরণ করছে তারাই যারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' (সূরা হুদ ঃ ২৭)

কিন্তু নূহ আ. দাওয়াতী কাজে নিরলস পরিশ্রম করেন। এ কাজে তিনি তাঁর সাধ্যমত সমস্ত উপায় অবলম্বন করেন। তিনি দিবা-রাত্র, প্রকাশ্যে ও গোপনে উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে সবপন্থায় দাওয়াতী কাজ করেন।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْ هُمْ دُعَاءِىْ اِلاَّفِرَارًا. وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَارُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا.

'তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু! আমি আমার জাতির লোককে আপনার দিকে দিন রাত্রি ডেকেছি কিন্তু আমার ডাক তাদের এড়িয়ে চলার মাত্রা বৃদ্ধিই করেছে আর যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি– যেন তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তারা তাদের কানে আঙুল ঠুকে দিয়েছে এবং নিজেদের কাপড় দ্বারা তাদের মুখ ঢেকে নিয়েছে। নিজেদের আচরণে তারা অনমনীয় হয়ে দাড়িয়েছে এবং খুব বেশি অহংকার করেছে। পরে তাদেরকে আমি উচ্চস্বরে ডেকেছি ও প্রকাশ্যে তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছি; গোপনে গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।' (সূরা নূহ ঃ ৫-৯)

এভাবে নূহ আ. তাঁর জাতিকে সকল পন্থায় আল্লাহকে মেনে নেয়া এবং তাঁর হুকুম আহকামকে কার্যকরী করার দিকে আহ্বান করেন। কিন্তু জাতির পরিচালক ও ধনিক শ্রেণী উক্ত দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আর কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও দুর্বল লোক তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল। লোকেরা নবীকে একজন সাধারণ মানুষ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নিম্নশ্রেণীর লোক বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলো, তারা আরো বললো ঃ

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِه مَا هٰذَاۤ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَاءِنَا الاَوَّلِيْنَ. اِنْ هُوَ اِلاَّ رَجُلٌ بِه جِنَّةٌ فَتَرَ بَّصُوْا بِه حَتّٰى حِيْنٍ.

তাঁর জাতির যে সরদাররা তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা বলতে লাগলো; এ ব্যক্তি তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আল্লাহ যদি পাঠাতেন তবে ফেরেশতা পাঠাতেন। তাঁর দাওয়াতের এ ধরনের কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার সময় হতে কখনও শুনি নাই (যে মানুষ রসূল হয়ে এসেছে)। আসলে লোকটার মধ্যে পাগলামী রয়েছে। কিছুকাল আরও দেখে নাও। (হয়ত ভালো হয়ে যেতে পারে) (সূরা মু'মিনুন ঃ ২৪-২৫)
অন্যত্র আল্লাহ তাদের অবস্থা জানিয়ে বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَاوَ قَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّانْدُجِرَ.

'ইতোপূর্বে নূহের জাতির জনগণ অমান্য করেছে। তারা আমার বান্দাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। আর তারা বলেছিল এতো দিগভ্রান্ত, পাগল! এবং সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত ও উপেক্ষিত হয়েছে।' (সূরা ক্বামার ঃ ৯)
শেষে তারা নূহ আ.-এর একনিষ্ঠ অনুসারী দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে সরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করলো। আর বললো ঃ

قَالُوْآ اَنُؤْمِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الاَرْذَلُوْنَ. قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. اِنْ حِسَابُهُمْ اِلاَّ عَلى رَبِّى لَوْ تَشْعُرُوْنَ. وَمَآ لَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আমরা কি তোমাকে মেনে নিব? অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরাই তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছে..... নূহ আ.-এর জবাবে বলেন, 'আমার কাজ এটা নয় যে, যারা ঈমান আনবে তাদেরকে আমি বিতাড়িত করবো।" (সূরা শু'আরা ঃ ১১১-১১৪)
হযরত নূহ আ-এর অনুগতদের সম্পর্কে তিনি বললেন, এ সকল দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোক যারা মনে প্রাণে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে তারা তাদের জাতির নিকট এ জন্য তুচ্ছ ও নিম্নমানের যে, তারা তাদের মত সম্পদ ও বিত্তশালী নয়। আর এ জন্যই তাদের (কাফিরদের) ধারণায় দরিদ্র মুমিনগণ কল্যাণ বা সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। কারণ তাদের ধারণা মতে সৌভাগ্য ও কল্যাণ সম্পদের মধ্যেই নিহিত। প্রকৃত পক্ষে এদের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত, যিনি তাদের অন্তর সম্পর্কে জ্ঞাত। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত সৌভাগ্য ও হিদায়াত বাহ্যিক ধন-সম্পদের

উপর নির্ভরশীল নয়। বরং অন্তরের নির্মলতা, নিয়তের ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপর নির্ভরশীল।

পবিত্র কুরআনে সূরা হুদের ২৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নূহ আ. তাঁর জাতির লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝালেন যে, তিনি পার্থিব কোন স্বার্থের বিনিময়ে তাদেরকে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেবার আহ্বান জানাচ্ছেন না, তিনি তাদের নিকট কোন সম্পদ বা কোন পদ ও পদবী চাচ্ছেন না। এই মহতী কাজের বিনিময় তো আল্লাহই তাকে প্রদান করবেন। সূরা হুদের ৩১ নং আয়াতের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি তাদেরকে আরও বুঝালেন যে, তাঁর কাছে না আছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আর না তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত, আর না তিনি কোন ফেরেশতা। অবশেষে তারা বললো ঃ

قَالُوْا يَانُوْحُ قَدْ جِدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

'হে নূহ; তুমি তো আমাদের সাথে ঝগড়া করছো, আর ঝগড়া করলে খুব বেশি মাত্রায়। এখন সেই আযাবটাই নিয়ে আস, যার হুমকি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, তুমি যদি সত্যবাদী হও।' (সূরা হুদ ঃ ৩২) অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছলো যে, নূহ আ. তার বর্ণনা করে বলেন,

وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَارُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

আর যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি যেন তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তাঁরা তাদের কানে আঙ্গুল ঠুসে দিয়েছে এবং নিজেদের কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নিয়েছে। নিজেদের আচরণে তারা অনমনীয় হয়ে দাড়িয়েছে এবং খুব বেশি অহংকার করেছে। (সূরা নূহ ঃ ৭)

তারা তাকে অপমান করে, যার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَاوَ قَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّانْدُجِرَ.

ইতোপূর্বে নূহের জাতির জনগণ মিথ্যা সাব্যাস্ত করেছে, তারা আমার বান্দাকে অসত্য মনে করেছে। এবং সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত ও উপেক্ষিত হয়েছে। (সূরা ক্বামার ঃ ৯)

অতঃপর অমান্যকারী জাতির প্রতি হযরত নূহ আ. বদদু'আ করলেন, তাদের ধ্বংসের পরিবেশ তৈরি হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَانُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ. قَالَ رَبِّ اَنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ. فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَاَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبقِيْنَ. اَنَّ فِىْ ذلِكَ الاٰيَةً وَمَاكَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

'তারা বললো, হে নূহ, তুমি যদি বিরত না হও তাহলে ভাগ্য বিপর্যস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
নূহ দু'আ করলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতির লোকেরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এখন আমার ও তাদের মাঝে তুমি চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে যেসব মুমিন রয়েছে তাদেরকে মুক্তি দাও। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একটি ভরা নৌকাতে বাঁচিয়ে দিয়েছি। এবং এরপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছি। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আর আসল কথা এই যে, তোমার রব মহাশক্তিশালী এবং দয়াবান।' (সূরা শু'আরা ১১৬-১২২)
এভাবেই হযরত নূহ আ. আল্লাহর হুকুম আহকাম ও বিধি বিধানকে জাতির লোকদের মাঝে কার্যকরী করার জন্য চরম ধৈর্যের সাথে চেষ্টা করেছেন। অবশেষে ৯৫০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ-২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩-১২৪

মাদকাসক্তি ঃ প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইন

তারেক মুহাম্মদ জায়েদ

মাদকাসক্তি একটি ভয়াবহ সমস্যা যা কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি নরনারীকে মাদকাসক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। একবার কেউ মাদকাসক্ত হলে এর ছোবল থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। নেশার চাহিদা পূরণে অর্থের প্রয়োজন। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশার অর্থ সংগ্রহের জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। যার ফলে রাষ্ট্রে, সমাজে ও সংসারে সৃষ্টি হয় অবশ্যম্ভাবী অশান্তি, অস্থিরতা। কুরআনে মাদক দ্রব্য এভাবে চিহ্নিত হয়েছে: 'শয়তানের অপকর্ম'।[১]

১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে বিশ্বব্যাপী মাদক বিরোধী গণসচেতনতার বার্তা নবায়ন করে সমগ্র বিশ্বকে আরেকবার উদ্দীপ্ত, জাগরিত ও উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশ মূলত মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক কারণে এদেশের অবস্থান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যান্য অনেক দেশ বাংলাদেশকে মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহার করে।

সারা বিশ্বে, বিশেষ করে আমাদের দেশে মাদকের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উভয়ই ব্যর্থ শত চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যকর ফল লাভ করতে পারছে না। এক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত ইসলামী আইন হতে পারে যথার্থ রক্ষাকবচ। কেননা ইসলামী আইন সমস্যার গভীর থেকে সমাধান করে। ইসলামী আইন সমস্যার প্রতিকারের তুলনায় পূর্বাহ্নেই তার প্রতিরোধের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়।[২]

মাদক বা নারকটিক (Narcotics)

মাদককে ইংরেজীতে নারকটিক বলা হয়।[৩] নাকরটিক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ঘুম' বা অবসাদ উৎপাদনকারী। নারকটিক বলতে সেসব মাদককে বুঝায় যা ঘুম অথবা অবসাদ উৎপাদন করে এবং চৈতন্যের বিলোপ ঘটায়। এসব মাদকের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

লেখক : প্রভাষক, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(ক) এগুলো আপন নিষিদ্ধ জগতে মানুষকে আকর্ষণের অন্তর্নিহিত অশুভ শক্তিসম্পন্ন।

(খ) এগুলো ব্যবহাকারীর মধ্যে এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে এর ব্যবহারকারীকে বশ করে ফেলে।

(গ) ব্যবহারকারীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান আসক্তি উৎপাদন করে।

(ঘ) শরীরের ওপর ক্রমাগত অধিক মাত্রায় গ্রহণযোগ্যতা বা সহনশীলতার জন্ম দেয়

(ঙ) এগুলো ব্যবহাররকারীর শরীরে প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়া ঘটায় বা কখনও জীবন সংহারক রূপ ধারণ করতে পারে এবং

(চ) সবকিছু মিলিয়ে ব্যবহারকারীকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিকভাবে পঙ্গু করে দেয়।

নিম্নবর্ণিত প্রকার ও প্রকৃতির মাদককে নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত মনে করা হয়

(ক) অপিয়ডস বা ঘুম উৎপাদনকারী, বেদনানাশক, অবসাদ সৃষ্টিকারী। যথা- আফিম, হেরোইন, পেথিডিন, মরফিন, মেথাডন ইত্যাদি।

(খ) স্টিমুল্যান্টস বা উত্তেজক। যথা-কোকেন, অ্যামফিটামিন ইত্যাদি।

(গ) সিডেটিভ, হিপনোটিক ও ট্রাংকুইলাইজার যথা- বেনজোডায়াজিপাইনস বা ভ্যালিয়াম, লাইব্রিয়াম, অ্যাটিভান, সিডাকসিন, বারবিচুরেটস, নেমবুটাল, টুইনাল ইত্যাদি

(ঘ) হ্যালুসিনোজেনস বা মনোবৈকল্য ও বিভ্রম সৃষ্টিকারী। যথা–ক্যানাবিস বা গাঁজা, এলএসডি, ফেনসাইক্লিডাইন ইত্যাদি।

এ্যালকোহলের সংগা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর প্রথম তফসীলে ক শ্রেণী, খ শ্রেণী ও গ শ্রেণী নামে তিন শ্রেণীর মাদকদ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীর অধীনে চিহ্নিত মাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের ২নং ধারা অনুযায়ী এ্যালকোহল অর্থ হলো স্পিরিট। যে কোন ধরনের মদ, ওয়াইন, বিয়ার বা ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অধিক এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন তরল পদার্থও এ্যালকোহল নামে অভিহিত হবে। আর 'বিয়ার' অর্থঃ মল্ট (Malt) বা হপ্স (Hops) সহযোগে ব্রিউইং (Brewing) পদ্ধতিতে ব্রিউয়ারীতে (Brewery) প্রস্তুতকৃত অন্যূন ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন পানীয়।[৪] সুতরাং এ্যালকোহল (Alchohol) হলো সকল প্রকার মদ, রেকটিফাইড স্পিরিট (Rectified Spirit), ও রেকটিফাইড স্পিরিট সহযোগে যে কোন ঔষধ বা তরল পদার্থ, ওয়াশ, বিয়ার (Beer), কিংবা ০.৫% এর অধিক এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন তরল পদার্থ।

গাঁজা বা ক্যানাবিস

গাঁজা সেবনে মস্তিষ্কের বৈকল্য ঘটে এবং স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শৃঙ্খলায় বিপর্যয় ঘটে। ফলে গাঁজা সেবনকারীর চিন্তন, লিখন, বুদ্ধিচর্চা ও মনোযোগ সহকারে করণীয় যে কোনো কর্মক্ষমতা লুপ্ত হয়। এ অবস্থায় রাস্তাঘাটে ও কলকারখানায় জীবননাশকারী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গাঁজা মস্তিষ্কের কোষ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। এতে ব্রংকাইটিস, কণ্ঠনালীর ক্ষত, এমন কি ক্যান্সার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। গাঁজা মানুষের দেহের হরমোন ও জৈবরসায়ন ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সন্তান উৎপাদনকারী হরমোন ও শুক্রের ক্ষতি সাধন ও এগুলোর উৎপাদন হ্রাস করে মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিকাশে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

আফিম ও আফিমজাত মাদক

মরফিন, হেরোইন, পেথিডিন ইত্যাদি সাধারণভাবে বেদনানাশক, ঘুম উৎপাদক এবং হতাশা-ক্লান্তি, দুঃখ-দুশ্চিন্তা নাশ করে ব্যবহারকারীকে বিস্মৃতি, নৈঃশব্দ ও অপার্থিব প্রশান্তির জগতে পৌঁছে দেয়। তবে মাত্রা বেশি হলে এ প্রশান্তি জীবননাশী হতে পারে। হেরোইন মানুষের মস্তিষ্কের এনডোরফিন নামক স্বাভাবিক বেদনানাশক জৈবরাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন রোধ ও ক্ষতিসাধন করে শরীরের বেদনানাশক স্বীয় ব্যবস্থা লুপ্ত করে দেয়। এসব মাদকের আসক্তি ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল। এগুলো তার ব্যবহারকারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে এমন নির্ভরশীল করে ফেলে যে আসক্ত ব্যক্তি উক্ত মাদকের দাসে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে মাদকের অভাবে ব্যবহারকারীর দেহে খিচুনি ও অস্থিরতা দেখা দেয়, শরীর ঘেমে ওঠে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং অসহ্য যন্ত্রণায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেঁকে যায়। সময়মতো প্রত্যাশিত মাদক না পেলে ব্যবহারকারী মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। এ জাতীয় মাদক ব্যবহারে বমিভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য ও শ্বাসকষ্টসহ ফুসফুসের ক্ষতি হয়। এসব মাদকের ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারী শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় পতিত হয়। আসক্তির তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলে সময়মতো মাদকের অর্থ যোগাতে আসক্ত ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও খুনের মতো মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হতেও পিছপা হয় না।

কোকেন, অ্যামফিটামিন প্রভৃতি উত্তেজক মাদক

এগুলো উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এসব মাদকের ব্যবহারে ব্যবহারকারী আপাতত অধিক শক্তিমান ও সুস্থ বোধ করে। এসব মাদক শরীর থেকে যাবতীয় ভয়-ভীতি, অবসাদ, নৈরাশ্য, বেদনা ও হতাশা দূর করে বিপুল কর্মক্ষমতা ও শক্তির অনুভূতি আনে যা

ব্যবহারকারীকে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত করে। এসব মাদক কখনো কখনো মানসিক বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে এবং এর ব্যবহারে রক্ত চলাচল ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, চোখের তারা অধিক প্রসারিত হয়। এসব মাদক আপাতত উত্তেজক হলেও একটানা ব্যবহারে এগুলোর প্রভাবে মানব দেহের স্বাভাবিক শক্তি লোপ পায় এবং ব্যবহারকারী শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়।

বাংলাদেশে যেসব মাদকের অপব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলো হলো ঃ ক্যানাবিস বা গাঁজা, চরস, ভাং, আফিম, পেথিডিন, হেরোইন, মরফিন এবং রিলাকজেন, সিডাকসিন ও ভ্যালিয়াম জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ট্রাংকুলাইজার ও সিডেটিভস। এছাড়া অতি স্বল্প পরিমাণ এলএসডি, বারবিচ্যুরটস বা ম্যানড্রাগস জাতীয় বিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদকেরও ব্যবহার আছে বলে শোনা যায়। সারাদেশে মাদকাসক্তির পরিসংখ্যান নিলে মদ, গাঁজা ও পেথিডিনে আসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা সর্বাধিক হবে বলে মনে হয়।

মাদকের ব্যবহার

এককালে প্রকৃতিজাত আফিম, কোকেন, গাঁজা ইত্যাদি মাদক ছিল সনাতন চিকিৎসা ও তথাকথিত যোগতন্ত্র বা পৌত্তলিক ধর্ম সাধনার উপকরণ। কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ তা পরিবর্তিত হয়েছে নিছক নেশা, অপসংস্কৃতি ও বিনোদনের বিকৃত উপকরণে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ এলএসডি, বারবিচুরেটস, অ্যামফিটামিন, পেথিডিন, হেরোইন-এর মতো শত শত কৃত্রিম মাদক এবং এর অনেকগুলোই আবার জীবনবিধ্বংসী। মাদক মূলত দু'ভাবে ব্যবহৃত হতে পারেঃ
(১) চিকিৎসা কাজে; (২) নেশা রূপে।

চিকিৎসা কাজে মাদক ব্যবহার করা হয় একটি বিশেষ রোগ নিরাময়ের জন্য নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ও পরিমাণে। সুনির্দিষ্ট সময়কাল পার হলে উক্ত মাদকের প্রয়োগ বন্ধ করা হয়। রোগ নিরাময় ছাড়া যে কোন মাদকের যে কোনো ব্যবহারকেই অপব্যবহার বলা যায়। মাদকের অপব্যবহার দুই রকম হতে পারে ঃ

(১) চিকিৎসা বহির্ভূত নন-মেডিক্যাল ব্যবহার যা অবৈজ্ঞানিক বা অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কোনো মাত্রা বা পরিমিতি বর্জিতভাবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যথা- পেথিডিন মরফিন-এর ব্যবহার

(২) চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সামাজিক মূল্যবোধের কাছে অগ্রহণীয়, অপ্রয়োজনীয়, অবৈধ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিকর মাদকের ব্যবহার। যথা-এলএসডি ও হেরোইন-এর ব্যবহার।

আইনের মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে অতি প্রাচীন কাল থেকে আফিম, গাঁজা, ভাং, চরস, চণ্ডু ইত্যাদি সনাতন মাদকের ব্যবহার ছিল। পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শাসনামলে

বিদেশিদের দ্বারা এ দেশে কোকেনের ব্যবহারও প্রচলিত হয়। তখন যত্রতত্র এসব মাদকের উৎপাদন, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার চলতো। একে আইনের আওতায় এনে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম ১৮৭৮ সালে অপিয়াম অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে আফিমের উৎপাদন, সরবরাহ, পরিবহন ও ক্রয়-বিক্রয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এগুলো যত্রতত্র উৎপাদিত ও বিক্রয় না হয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে ও স্থানে উৎপাদন এবং বিক্রি হবে। একই উদ্দেশ্যে মদ ও গাঁজা জাতীয় মাদকগুলোর উৎপাদন ও বিক্রিকে লাইসেন্সের আওতায় এনে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯০৯ সালে 'এক্সাইজ অ্যাক্ট' প্রণীত হয়। ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক নতুন মাদকের আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হওয়ায় সেগুলোকে পুরাতন আইনে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলে ১৯৩০ সালে 'ডেঞ্জারাস ড্রাগস অ্যাক্ট' এবং ১৯৩২ সালে 'অপিয়াম স্মোকিং অ্যাক্ট' নামক দু'টি পৃথক আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৩৯ সালের ডিডি রুলসের মাধ্যমে এগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ, পরিবহন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইসেন্স, পারমিট ও পাস প্রথার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে মদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৫০ সালের 'প্রহিবিশন রুলস' প্রণীত হয় এবং এতে মদ্যপানের জন্য বিধিবদ্ধ আইনে পারমিট প্রথার ব্যবস্থা রাখা হয়। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সারাবিশ্বে আফিম ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে ১৯৫৭ সালে 'অপিয়াম সেলস রুলস' নামক একটি পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করে আফিম ব্যবহারে পাস প্রথার প্রবর্তন করা হয় এবং বলা হয়, এ প্রথায় পুরাতন আফিমসেবীদের রেজিষ্ট্রিভুক্ত করে পাসের মাধ্যমে তাদের বরাদ্দকৃত আফিম ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে এর ব্যবহার একবারে লুপ্ত করতে হবে।

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ১৯৯০

সময়ের বিবর্তনে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ও ব্যবহার রোধকল্পে বাংলাদেশ সরকার 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০' প্রবর্তন করে। যদ্বারা The opium Act, ১৮৫৭, The Opium Act, ১৮৭৮, Axeise Act, ১৯০৯, Dangerous Drugs Act, ১৯৩০, Opium smoking Act, ১৯৩২ বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং এই আইন ১৯৯০ সালের ২রা জানুয়ারী হতে কার্যকর হয়।

এই আইনে এলকোহল ব্যতীত যে কোন ধরনের মাদক দ্রব্যের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তরকরণ, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তগতকরণ, সংরক্ষণ, মজুতকরণ, প্রদর্শন এবং ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ

আইন মদ তৈরীর উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোন গাছগাছালি বা উপাদানের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তরকরণ, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তগতকরণ, সংরক্ষণ, মজুদকরণ এবং প্রদর্শনও নিষিদ্ধ করেছে। অবশ্য যে কোন ধরনের মাদক দ্রব্যের যথাক্রমে উৎপাদন, ব্যবহার, বহন এবং স্থানান্তরকরণের জন্য লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্রধারী ব্যক্তিদের বেলায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। তবে বৈধ লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা পাশ ছাড়া এ নিষেধাজ্ঞাসমূহ ভঙ্গ করা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাদক দ্রব্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন অথবা অন্য যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। আইনে আরো বলা আছে যে, মাদক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এমন কোন যন্ত্রপাতি বা বস্তু যিনি নিজের কাছে রাখবেন, তিনিও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটনে নিজের ঘরবাড়ি বা পরিবহণ অন্যকে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়াও এ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ছাড়া মাদক দ্রব্য আইনের আওতায় যেসব কাজ করার জন্য লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা পাশ প্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে সেসব কাজ লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা পাশ ছাড়া করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। এমনকি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রে বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। তল্লাশী চালানো, জব্দ করা বা গ্রেপ্তার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাদক দ্রব্য বিভাগের কোন কর্মকর্তা যদি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কোন স্থানে তলস্নাশি চালান, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি জব্দ করেন অথবা হয়রানির উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন, তবে সেই কর্মকর্তাও এ আইনে দণ্ডযোগ্য হবেন।

মাদকদ্রব্য চাষাবাদ ও উৎপাদন প্রসঙ্গে

'মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০' অনুযায়ী

১)এ্যালকোহল ব্যতীত অন্য কোন মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন প্রক্রিয়া-জাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানী-রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাবে না, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা বা এর পৃষ্ঠপোষকতা করা যাবে না।

২) কোন মাদকদ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এই প্রকার কোন দ্রব্য বা উদ্ভিদের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাবে না।

৩) উপরোক্ত মাদকদ্রব্য বা উদ্ভিদ কোন অনুমোদিত ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে ব্যবহার, চিকিৎসা বা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন হলে এর বিধান নিম্নরূপ:

* লাইসেন্সবলে চাষাবাদ, উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, ও প্রদর্শন করা যাবে।
* পারমিটবলে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাবে।
* পাসবলে বহন ও ব্যবহার করা যাবে।[৫]

ধারা ৯ এর বিধান লংঘনের দণ্ড

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯৯০ এর ধারা ১৯ এ কতিপয় মাদকদ্রব্যের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি লাইসেন্স/ পারমিট/ পাস ব্যতীত যদি এ্যালকোহল ছাড়া অন্য কোন মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে তবে সেই ব্যক্তি ১৯নং ধারা অনুযায়ী মাদকদ্রব্যের পরিমাণের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। শাস্তি প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি একবার দণ্ডিত হওয়ার পর পুনরায় অপরাধ করলে উক্ত অপরাধের জন্য বর্ণিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ্যালকোহল ব্যতীত অন্যান্য মাদকদ্রব্যগুলো হলো হেরোইন, কোকেন, কোকা উদ্ভূত মাদকদ্রব্য, পেথিডিন, মরফিন, টেট্টা হাইড্রো ক্যানাবিনল, অপিয়াস, ক্যানাবিস, রেসিন। মেথাডন, গাজা বা যে কোন ভেষজ ক্যানাবিস, যে কোন প্রজাতির ক্যানাবিনল গাছ, ফেনসাইক্লিআইন, মেথাকোয়ালন, এল এসডি বারবিরেটস এ্যামফিটামিন অথবা এগুলোর যে কোনটি দ্বারা প্রস্তুত মাদকদ্রব্য।

মাদকদ্রব্য উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহার ইত্যাদি প্রসঙ্গে

এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন ডিষ্টিলারী বা ব্রিউয়ারী স্থাপন করতে পারবেন না; কোন এ্যালকোহল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন ও ব্যবহার করতে পারবেন না; কোন এ্যালকোহল ঔষধ তৈরির উপাদান ব্যবহার করতে পারবেন না।

এই আইনের অধীনে প্রদত্ত পারমিট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এ্যালকোহল পান করতে পারবেন না; এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে অন্যূন সিভিল সার্জন বা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের কোন সহযোগী অধ্যাপকের লিখিত ব্যবস্থাপত্রের

ভিত্তি ছাড়া কোন মুসলমানকে এ্যালকোহল পান করার জন্য পারমিট দেওয়া যাবে না; তবে মুচি, মেথর, ডোম, চা বাগানের কুলি ও উপজাতীয়গণ কর্তৃক তাড়ী ও পচুঁই পান করার ক্ষেত্রে; এবং রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহের উপজাতীয়গণ কর্তৃক ঐতিহ্যগতভাবে প্রস্তুতকৃত মদ উক্ত জেলাসমূহের উপ-জাতীয়গণ কর্তৃক পান করার ক্ষেত্রে, এই আইনের কোন কিছু প্রযোজ্য হবে না।

সিভিল সার্জন কিংবা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের চেয়ে নিম্নের কোন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত মুসলমান রোগীর জন্য এ্যালকোহল গ্রহণের কোন অনুমতি দেওয়া যাবে না।

অর্থাৎ এই আইনে মুসলমান রোগীদের জন্য ব্যবস্থাপত্রে এ্যালকোহলের অন্তর্ভুক্তি কঠোরতার সাথে গ্রহণ করা হয়েছে, তবে অমুসলমান রোগীর ক্ষেত্রে যে কোন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে রোগ নিরাময়ের জন্য এ্যালকোহল গ্রহণের অনুমতি প্রদানের ইঙ্গিত বহন করে।

এই আইনের অধীনে মদ্যপানের প্রতিবন্ধকতা কিংবা এর আমদানী, ক্রয়, বহন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যে কোন বিদেশী নাগরিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত বারে বসে এ্যালকোহল পান করতে পারবেন এবং কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী বিদেশী নাগরিক বা শুল্ককর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পাসবইধারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত এ্যালকোহল আমদানি, রপ্তানী, ক্রয়, বহন, সংরক্ষণ বা পানের ব্যাপারে এই ধারার (ধারা ১০ ও ১০ক) কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না।[৬]

বার, ক্লাব, হোটেল ও মদের দোকানের মালিকদের পালনীয় কতিপয় নিয়মাবলী

বার, ক্লাব, হোটেল, দেশী ও বিদেশী মদের দোকানের মালিকদের পালনীয় কতিপয় নিয়মাবলী সম্পর্কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যে সার্কুলার জারি করে তা নিম্নরূপ:

ক) প্রত্যেক বার, ক্লাব, হোটেল, দেশী-বিদেশী মদের দোকানের মালিক কর্তৃপক্ষকে বার / দোকানের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে মদ ও মদজাতীয় পানীয় সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ যদি রেস্টুরেন্ট ও বার সংযুক্ত থাকে তাহলে বার এলাকা হতে রেস্টুরেন্ট এলাকা পৃথক হতে হবে। পাশাপাশি 'বার এলাকা' সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে বিবেচিত হবে। পারমিট ব্যতীত কোন লোককে এই সংরক্ষিত এলাকায় পাওয়া গেলে তাকে মদ/মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

খ) যে মদের দোকানের মদ বা মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হবে এর মালিক/ কর্তৃপক্ষ/ ম্যানেজার এবং কর্মচারিদের নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট সাইজের ফটো

সহজে নজরে পড়ে, বার অথবা ক্লাবের এইরূপ স্থানে কাঁচ দ্বারা বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ফটোসহ নামের তালিকা ঝুলানোর পূর্বে তা প্রস্তুত করে ২(দুই)টি কপি মালিক/কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পেশ করবেন। এইরূপ প্রতিস্বাক্ষরিত একটি কপি বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। কর্মচারিদের বদলি/ ছাটাই ইত্যাদি কারণে নতুন কর্মচারি নিয়োগ করা হলে তার/ তাদের ফটো এবং নাম-ঠিকানাসহ তালিকাটি নতুনভাবে প্রতিস্বাক্ষর করিয়ে নিয়ম মত ঝুলিয়ে রাখতে হবে। মদ/ মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহের জন্য সংরক্ষিত এলাকার পারমিটধারী এবং বোর্ডে তালিকাভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শনকালে পাওয়া গেলে তাকে অবৈধ মদ্য পানকারী বলে বিবেচনা করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই নির্দেশাবলী ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর ১৯, ২৩, ২৭ ও ২৮ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[৭]

লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে বিধিনিষেধ

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য হবেন না-১) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তি লাভের পর তিন বৎসর কাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে অথবা পাঁচ শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দণ্ডের টাকা আদায় করার পর তিন বৎসর কাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে;

২) তিনি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন; এবং

৩) তিনি এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা পারমিটের কোন শর্ত লংঘন করেন এবং সেইজন্য তার উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বাতিল হয়ে যায়।[৮]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর বিধানাবলীর সুষ্ঠু প্রতিপালনে সতর্কতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রাপ্ত কতিপয় অভিযোগের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর বিধানাবলীর সুষ্ঠু প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বন সম্পর্কে লাইসেন্সধারী বার ও মদের দোকান মালিকদের উদ্দেশ্যে একটি সার্কুলার ইস্যু করে। যেখানে বলা হয় যে, বৈধ লাইসেন্সধারীগণ যেন বৈধ পারমিটধারী নয় এমন সাধারণ বাংলাদেশী ব্যক্তিবর্গের নিকট এ্যালকোহল বিক্রয় না করে। উক্ত সার্কুলারে আইন ভঙ্গ করার শাস্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে: বৈধ পারমিটধারী নন এমন কোন

বাংলাদেশী ব্যক্তির নিকট মদ বিক্রয় করা হলে ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী মালিক বা পরিচালক এর বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর ২৭ এবং ২৮ ধারামতে লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ এবং বাতিলের বিধান প্রয়োগ করা হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই মর্মে সতর্ক করে দেয় যে, কোন 'বার' এর নিয়মিত কর্মচারি ছাড়া শুধুমাত্র পারমিটধারী বাংলাদেশী নাগরিক এবং বিদেশী নাগরিকের প্রবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব লাইসেন্সীর উপর বর্তায়। আকস্মিক অভিযানকালে এর কোন ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে লাইসেন্সধারীকে এর জন্য দায়ী করা হবে।[৯]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধ নীতি

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, চোরাচালান, বিক্রয় ও ব্যবহার প্রতিরোধে কোনো সুস্পষ্ট এবং বাস্তবানুগ প্রক্রিয়া নেই বললেই চলে। বিধিবদ্ধ আইনে মাদকের প্রতিরোধ বিষয়ে বলা থাকলেও তা তত্ত্বগত ব্যাপার মাত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে এর কোনো প্রয়োগিক সুফল দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আইনে আছে যে, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ করতে হবে এবং আইন ভঙ্গকারীর জন্য শাস্তির বিধানও আছে। কিন্তু প্রায় পনেরো কোটি জন-অধ্যুষিত এদেশের ব্যক্তিপর্যায়ে মাদকের অপব্যবহারে কে কী করছে তা নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ।[১০] আইনের বিধান মাদক প্রতিরোধের একটা উপায় মাত্র। কিন্তু এর মূল শক্তি নিহিত সমাজের সামগ্রিক পরিবেশে অর্থাৎ যে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিমণ্ডলে আমরা বিচরণ করছি, সেখানে। প্রতিরোধ সমাজের প্রতিটি মানুষের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা একটি সমন্বিত ও স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা। পরিপূর্ণভাবে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আরোপিত কোনো ব্যাপার নয়। প্রতিরোধ শুধু সমাজের নয়, প্রতিরোধ মাদক ব্যবহারকারীর নিজের অন্তর ও অস্তিত্বের ব্যাপারও। মাদকের প্রসার যাতে ঘটতে না পারে এজন্য সরকারী ও বেসরকারী যে কোনো সংস্থার যে কোনো ধরনের কাজকেই প্রতিরোধমূলক কাজ বলা যায়। নারকটিকস এন্ড লিকার বিভাগের লাইসেন্স প্রদান ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াও এ প্রতিরোধ কর্মের বিশেষ অংশ। অন্যান্য সরকারি সংস্থা, যথা পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, সমাজসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, জাতীয় প্রচার মাধ্যম, বেসরকারি ক্লাব বা সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সকলের মাদকের বিরুদ্ধে যে কোনো তৎপরতা, প্রচারমূলক, শিক্ষামূলক বা সেবামূলক হোক অথবা হোক দমনমূলক, তাকে প্রতিরোধ বলা যায়।

মাদকের চাহিদা হ্রাসের দৃষ্টিভঙ্গি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে যতই আইনের কড়াকড়ি করা যাক অথবা অপরাধ দমন তৎপরতা জোরদার করা যাক- এর কোনোটাই ফলপ্রসূ হবার নয়, যদি না মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাসে আমরা সফল হতে পারি। এ চাহিদা আমাদের সমাজ কাঠামোর মধ্য থেকেই বেড়ে ওঠা এমন এক অশুভ শক্তি যা মাদক এবং মাদক ব্যবসায়ীদের প্রবল স্রোতের মতো তার দিকে টেনে আনছে। চাহিদা কোনো ব্যক্তি নয়- যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কোনো পার্থিব বস্তু নয়- যাকে শক্তি প্রয়োগে ধ্বংস করা যায়। এটা হলো সামাজিক বিবর্তন ধারায় সমাজ কাঠামোর মধ্য থেকে নানাবিধ অবক্ষয়ের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রন্থিত এক ধ্বংসাত্মক অপশক্তি। যাকে রুখতে হলে কোনো বহিঃশক্তি নয়, সমাজের মধ্য থেকেই শক্তির সঞ্চয় করতে হবে। এক কথায় যেমন শরীরের রোগকে প্রতিরোধক ক্ষমতা দিয়ে ঠেকাতে হয়, আমাদের সমাজের মাদকাসক্তি রোগও এ সমাজেরই রক্ত কণিকায় নিহিত মাদকবিরোধী প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এন্টিবডি দিয়ে রুখতে হবে। মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাসে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ প্রতিরোধ ক্ষমতার জাগরণই হলো প্রকৃত ফলপ্রসূ কর্ম।

মাদকের চাহিদা হ্রাসের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা

ক) মাদকের কুফল ও ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষ হয় অজ্ঞ না হয় উদাসীন। সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জেনেও যেখানে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে একের পর এক সিগারেট খেতে দেখা যায় সেখানে গাঁজা বা হেরোইনসেবী যে তার অজ্ঞতার কারণে এমন কি এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জেনেও তা ত্যাগ করবে না এটাই স্বাভাবিক। কেননা এসব ক্ষেত্রে কুফল ও ক্ষতিকারক প্রভাবটি আগুনে হাত দিয়ে হাত পোড়ানোর মতো তাৎক্ষণিক এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং কিছুটা বিলম্বে ঘটিতব্য এবং অপ্রত্যক্ষ।

খ) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবছর দেশে বাস্তব জ্ঞানবিবর্জিত তথাকথিত উচ্চশিক্ষার হার বাড়িয়ে চলেছে, কিন্তু এসব শিক্ষিত তরুণদের জন্য নেই কোনো কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা অথবা জীবিকার নিরাপদ কোনো ব্যবস্থা। ফলে বেকারত্বের হতাশা ও নৈরাশ্য তাদের জীবনবিমুখ, অপরাধপ্রবণ এবং মাদকাসক্ত করে তুলছে।

গ) আমাদের দেশে অনেক অসাধু রাজনীতিবিদ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসব হতাশাগ্রস্ত তরুণের হাত করে চক্রান্ত ও সুকৌশলে তাদেরকে

মাদকে আসক্ত করে এক অশুভ শক্তিতে পরিণত করছে এবং প্রয়োজন মাফিক নিজেদের স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করছে।

ঘ) আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতায় যুব ও তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা ক্রমবিলুপ্তির পথে। ফলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে অশুভ শক্তির বিকাশ ঘটছে এবং এর অনুষঙ্গ হিসেবে আসছে মাদকাসক্তি। সৃষ্টি হচ্ছে মাদকের সর্বগ্রাসী চাহিদা।

ঙ) যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের সাথে তাদের মধ্য থেকে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিলোপ ঘটে সেখানে পাশ্চাত্যের বিকৃত ও অপসংস্কৃতি স্থান নিচ্ছে। আর সাধারণ নিয়মেই পাশ্চাত্যের বিকৃত ও অপসংস্কৃতির চালিকাশক্তি মাদকও তাদের অস্থি-মজ্জায় আসন করে নিচ্ছে।

চ) আমাদের সমাজের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও কৃষ্টির অপভ্রংশের লাগামহীন বিকাশের ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতায় সংকট দেখা দিচ্ছে। পাশ্চাত্যের নিয়মে পরিবার প্রথার দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। মাতা-পিতার মধ্যে বারবার বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা অনিয়মতান্ত্রিক ও উচ্ছৃঙ্খল যৌন-জীবন এখন এ সমাজে নতুন ব্যাপার নয়। এর পরেও অর্থ ও খ্যাতির মোহে তারা গৃহ অপেক্ষা অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ক্লাবেই অধিক সময় ব্যয় করেন। এতে সন্তানদের জীবনে মারাত্মক একাকীত্বের সংকট ও যন্ত্রণাময় জটিলতার সৃষ্টি হয়।

ছ) আমাদের দেশে মানুষের চিত্তের মুক্তির জন্য সামাজিক সংগঠনের একান্ত অভাব। শহর এলাকায় যেসব ক্লাব বা সংঘ আছে তার অধিকাংশেই সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার পরিবর্তে চলে তাস ও জুয়া, নয়তো নাশকতামূলক দৃশ্য সম্বলিত অপসংস্কৃতির ধারক চলচ্চিত্র অথবা পর্ণ ছবির ভিসিআর প্রদর্শনী। এর অধিকাংশই কোমলমতি তরুণদের মধ্যে বিকৃত মানসিকতা ও মাদকাসক্তির জন্ম দেয়।

জ) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধব অথবা প্রতিবেশীর প্রভাব ও প্ররোচনায়, নিছক কৌতুহলবশে, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের আশায়, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অথবা নিছক ফ্যাশন হিসেবে অনেকে মাদক গ্রহণ করে ক্রমাগত আসক্তির দিকে ঢলে পড়ছে।

ঝ) মাদকের সহজলভ্যতাও মাদকের চাহিদা হ্রাসে আমাদের দেশে একটি বড় অন্ত রায়। গণ-মানুষের সচেতনতার অভাব ও উদাসীনতার সুযোগে মাদক ব্যবসায়ী

বা মাদকাসক্ত ব্যক্তি অতি সহজেই যে কোনো পাড়া ও মহল্লায় আসন গেড়ে বসে এবং কোমলমতি কিশোর ও তরুণদের নানা কৌশলে সিগারেট বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে অজান্তে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাদকাসক্ত করে তোলে।

প্রতিষেধক বা অপরাধ দমন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিক্রয় ও ব্যবহার ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম ও অপরাধ সংঘটিত হয়, বিদ্যমান আইনে তাকে নিয়ন্ত্রণ, দমন ও তার বিচার প্রক্রিয়াকে অপরাধ দমন প্রক্রিয়া বলা যায়। এ ক্ষেত্রে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্স বহির্ভূত ব্যক্তি উভয়েই অপরাধী হতে পারে। যে মাদকের নিয়ন্ত্রণে এ দমন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত, সেটি আইনানুগভাবে বৈধ অথবা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বে-আইনি হতে পারে। যথা পেথিডিন ও হেরোইন। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষেধক বা অপরাধ দমন কার্যে যেসব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়োজিত তারা হলো নারকটিকস এন্ড লিকার বিভাগ, পুলিশ, কাস্টমস, বিডিআর এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসকের সাথে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেসি বা বিচার বিভাগ। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তল্লাশির মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের আনুষঙ্গিক মাদকদ্রব্য আটক করা হয়। সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়, অপরাধের তদন্ত হয় এবং পরিশেষে কোর্টে বিচারের মাধ্যমে তার শাস্তির ব্যবস্থা করে অন্য কেউ যাতে উক্ত অপরাধ না করে তার নজির সৃষ্টি করে মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

মাদকাসক্তদের তালিকা প্রস্তুত ও চিকিৎসা

মাদকাসক্তদের চিকিৎসার প্রয়োজনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর মহা-পরিচালক জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করবেন। কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজে বা তার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক বা চিকিৎসক ইচ্ছা করলে লিখিতভাবে তাদের নাম তালিকাভুক্তির জন্য পাঠাতে পারেন। এই সমস্ত তালিকাভুক্ত মাদকাসক্তের চিকিৎসার জন্য বোর্ড যতদূর সম্ভব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১১]

মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, নিরাময় কেন্দ্র ইত্যাদি

এই আইনের প্রয়োজনে -

ক) সরকার মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে;

খ) লাইসেন্সবলে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যাবে;

গ) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেল হাসপাতালসহ কোন সরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রকে মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা দিতে পারবে।[১২]

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা

(১) যদি মহাপরিচালক বা তাঁর নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জানতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে প্রায়শ অপ্রকৃতিস্থ থাকেন এবং তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য অনতিবিলম্বে তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন, তাহলে মহাপরিচালক বা উক্ত কর্মকর্তা লিখিত নোটিশ দ্বারা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে চিকিৎসার্থে কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

২) যদি প্রদত্ত নোটিশে উল্লেখিত ব্যক্তি এর মর্মার্থ বুঝতে অক্ষম হন, তাহলে নোটিশটি তার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের উপর জারি করতে হবে এবং যার উপর নোটিশটি জারী হবে তিনি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থে কোন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে হাজির করবেন।

৩) নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ মান্য করা না হলে নোটিশ প্রদানকারী কর্মকর্তা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মূখ্য মহানগর হাকিমের নিকট মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পুরাতন আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সমস্যা

বাংলাদেশে মাদকের নিয়ন্ত্রণে তার চাহিদা ও সরবরাহ এবং নতুন আসক্তি নিয়ন্ত্রণের সাথে পুরাতন আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একজন আসক্ত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান একটি ক্যান্সার আক্রান্ত জীবকোষের সমান। কেননা তার সমস্যা একক সমস্যা নয়। সে অন্যদেরও ক্যান্সার আক্রান্ত জীবকোষটির মতো কলুষিত ও আক্রান্ত করতে পারে। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যাতে অন্যদেরও আসক্ত করতে না পারে এজন্য সর্বাগ্রে তার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন দরকার। বাংলাদেশে এরকম চিকিৎসা এখনও কোনো পরিকল্পিত ও সমন্বিত রূপ লাভ করেনি। এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যতটুকু চিকিৎসা সুযোগ বিদ্যমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিচ্ছিন্নভাবে এবং ব্যক্তি বা সংগঠনের একক প্রচেষ্টা হিসেবে সম্পন্ন হচ্ছে। অতি সম্প্রতি দু'একটি হাসপাতাল ও ব্যক্তি-উদ্যোগ ভিত্তিক ক্লিনিকে এরকম চিকিৎসা কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যমান সমস্যাগুলো হলো, অনেক ক্ষেত্রে আসক্ত ব্যক্তিরা তাদের সামাজিক মর্যাদা, লোকলজ্জা ও পরিচিতি প্রকাশের ভয়ে চিকিৎসকের

শরণাপন্ন হতে চান না। বাংলাদেশে মাদকাসক্তির চিকিৎসা আছে- এ তথ্যটি সবার জানা নেই। ফলে আসক্ত ব্যক্তি ও তাদের অজ্ঞ আত্মীয়-পরিজন চিকিৎসকের কাছে যান না। মাদকাসক্তির জন্য যেসব ওষুধ ও উপকরণ দরকার বাংলাদেশে তা এখনও পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য নয়। আসক্ত ব্যক্তি চিকিৎসার পরে আবার যাতে মাদকে আসক্ত না হতে পারে তার জন্য তার পুনর্বাসন, তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা, তার জন্য কর্মসংস্থান করা, তার নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা ইত্যাদি বাংলাদেশে এখনও পরিপূর্ণতা পায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আসক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে ভাবি এবং তার প্রতি বিরূপ আচরণ করি। ফলে সে নিরাপত্তাহীনতায়, হীনমন্যতায় ও আত্মগ্লানিতে ভোগে আবার পূর্বের অভ্যাসে ফিরে যেতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সবসময় একজন রোগী হিসেবে দেখে তাকে সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে সুস্থ করে তুলতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে যেসব সরকারি সংস্থা নিয়োজিত তাদের প্রত্যেকের কার্যপদ্ধতিই বিচ্ছিন্ন ও যার যার বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ও কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কোনো সর্বজনীন পরিকল্পনা ও সমন্বিত কর্মপদ্ধতি নেই। ফলে মাঠ পর্যায়ে এসব বিচ্ছিন্ন কর্মধারা অনেক প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করছে এবং একে অন্যের কর্মের ব্যাপারে উদাসীন বলে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী কোনো সামগ্রিক ও অখণ্ড রূপ গ্রহণ করতে পারছে না।

নতুন আসক্তি রোধ সমস্যা

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের নতুন আসক্তি রোধ সমস্যার অনেকখানিই মাদকের চাহিদা হ্রাসের দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রে আলোচিত হয়েছে। কেননা নতুন আসক্তি চাহিদারই সংশ্লিষ্ট বিষয়। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তা হলো, মাদকের সহজলভ্যতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, সামাজিক অবক্ষয় অথবা তরুণ চিত্তের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও বন্ধু-বান্ধবের প্রভাবের পাশাপাশি নতুন আসক্তি রোধে যে সমস্যাটি তীব্রতর তা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন একক ব্যক্তির চরিত্রে পারিপার্শ্বিক প্রভাব জয় করার, নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও মনোদৈহিক চাপ সহ্য করার এবং বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উপেক্ষা করার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভাব। মাদকাসক্তির লোভনীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতার দুর্বলতা তাকে মাদকাসক্তির শিকারে পরিণত করে।

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে মাদক দ্রব্যের সংগা

যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে 'মাদক দ্রব্য' বলা হয়। আরবীতে এটিকেই খামর (خمر) বলে।

ফিকহের পরিভাষায়, যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং যা সেবনে বোধশক্তি হ্রাস পায় তাদের সকল শ্রেণীই 'মাদক দ্রব্য' (খামর) এর অন্তর্ভুক্ত।[১৩]

মাদক নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আল-কুরআনের আয়াত

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কয়েকটি প্রেক্ষাপটে মাদককে হারাম করেছেন। মাদক হারাম হওয়া প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আয়াতঃ

'হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো'।[১৪]

এরপর আরেকটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মাদকের গুনাহ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেনঃ 'লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক'।[১৫]

সবশেষে আল্লাহ তাআলা পূর্ণাঙ্গভাবে মাদক গ্রহণকে হারাম ঘোষণা করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমেঃ 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো'।[১৬]

হাদীসে মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

রসূলুল্লাহ স. এর অনেক হাদীসে মদ পানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ও তার অপকারিতার কথা উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

'নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তু মাদক দ্রব্য এবং নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তু হারাম'।[১৭]

'যে পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম'।[১৮]

'যে জিনিস অধিক পরিমাণ (পান করলে) নেশা সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম'।[১৯]

'সব নেশার জিনিসই হারাম। আর যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম'।[২০]

রসূলুল্লাহ স. নেশা উদ্রেককারী এবং নেশার প্রতি আকৃষ্টকারী প্রত্যেক বস্তু সেবন নিষিদ্ধ করেছেন। 'হযরত দায়লাম হিময়ারী রা. বলেন, আমি রসূলে কারীম স. কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা শীতপ্রধান এলাকায় বাস করি এবং কঠোর পরিশ্রমের কাজ করি। আমাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য ও শীতের প্রকোপ থেকে কিছুটা স্বস্তির জন্য গম হতে প্রস্তুতকৃত শরাব পান করে থাকি। রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, এতে নেশার সৃষ্টি হয় কি? আমি বললাম, হাঁ! তিনি বললেন,

তাহলে তোমরা তা পরিহার করো। আমি বললাম, কিন্তু লোকেরা তো তা পরিহার করতে চাইবে না। তিনি বললেন, তারা তা পরিহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো'।
'তোমার সম্প্রদায়কে অবহিত করবে যে, নেশা উদ্রেককারী সব জিনিস হারাম'।

খামর বা alcohol[১৭] এর অপকারিতা ও উপকারিতা প্রসঙ্গ

কুরআনে সূরা বাকারার ২১৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ 'লোকেরা আপনাকে (হে নবী) মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এ দুটোতেই বড় পাপ (অকল্যাণ) রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু উভয় কাজের (অর্থাৎ মদ ও জুয়ার) পাপ অপকারিতা তাদের উপকারিতা থেকে অনেক বেশী'।

আল্লাহ সত্য বলেন। মদের উপকার থেকে অপকার অনেক বেশী। মদ পান করলে তা রক্তে চলে যায় ও কিছু ক্যালোরির যোগান দেয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং রক্তবাহী শিরা প্রসারিত হয়। মদে শরীরের কর্মশক্তি যা বাড়ায় তা নগনণ্য। এতে কোন পুষ্টিসাধন হয় না, আর অন্যান্য প্রভাব শরীরের কোন কাজেই লাগে না। তবে পানীয় হিসাবে নয়, এর বাইরে মদ বা এলকোহলের কিছু উপকারী ভূমিকা রয়েছে যেমনঃ

(১) পরিশ্রুত পানিতে ৭০% এ্যালকোহল মিশিয়ে ভাল জীবাণু প্রতিরোধক বা এন্টিসেপ্টিক তৈরি করা যায় এবং তা ইনজেকশন প্রয়োগের পূর্বে চামড়া জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। অপারশনের পূর্বে একজন শল্য চিকিৎসক এই ৭০% এলকোহল মিশ্রিত পানি দিয়ে হাত ভিজিয়ে নেন, তাতে হাত তাড়াতাড়ি শুকায় এবং জীবাণুমুক্ত হতে সাহায্য করে।

(২) টিংচার আইওডিন (এলকোহলে দ্রবীভূত আইওডিন) সার্জারীর পূর্বে চামড়া জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

(৩) এলকোহল অনেক রাসায়নিক নির্যাস বের করতে সাহায্য করে। অনেক রাসায়নিক দ্রব্য এলকোহলে সহজে গলে যায়। তাই এই এলকোহল নানাপ্রকার সুগন্ধি প্রস্তুত করতে ও লেবরেটরিতে রি-এজেন্টস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) রি-এজেন্ট হিসাবে এলকোহল রসায়ন ও প্রাণরসায়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) এলকোহল পচন রোধ করতে সাহায্য করে বলে সংরক্ষণকর (Preservative) দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পানীয় হিসাবে এলকোহল তথা মদের অপকারিতা অনেক যা গবেষণায় প্রমাণিত। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কের উপর এবং উচ্চ মানবীয় গুণবিশিষ্ট শক্তি

সর্বপ্রথম প্রভাবিত হয়। ঔষধ বিজ্ঞানীগণ একমত যে, মস্তিষ্কের উপর মদের প্রভাব সবসময়ই ক্ষতিকর। দুই বা তিন আউন্সের এক ডোজ হুইস্কি (৪০% এলকোহল) পানের ফলে মনোনিবেশ, মনোযোগ, স্ফূর্তিশক্তি, যুক্তিদানের ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি নষ্ট হয় এবং সময়জ্ঞান ও মস্তিষ্কের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। যেহেতু তার মনের ও বিবেকের ক্ষমতা হ্রাস পায়, নিজের দোষ দেখতে পায় না, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় তাই নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যে কোন কাজের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বেখেয়াল হয় এবং যেখানে বিচারশক্তি ও ভাল-মন্দ বুঝে কাজ করার প্রয়োজন হয় সে সময় তা করতে পারে না। যদি রক্তে মদের পরিমাণ ০.১৫% (১৫০মি.গ্রা.) বা তার বেশী হয় তাহলে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির গাড়ী চালানো পথচারীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। মস্তিষ্কে মদের উপস্থিতি মাংসপেশিকে নির্দেশ মানতে বিলম্বিত করে।[১৮]

মদের ব্যবসা ও উৎপাদন সম্পর্কে ইসলাম[১৯]

নবী করীম স. মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হচ্ছে: মদ্যপায়ী, উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, বহনকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, মূল্য গ্রহণকারী, সেই মূল্য ভোগকারী, ক্রেতা ও যার জন্যে তা ক্রয় করা হয়। এসকল শ্রেণীর মানুষের উপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ।[২০]

মদপানের সমস্ত পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রি করাও নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে লোক (ক্ষেতের) আঙ্গুরের ফসল কেটে তা জমা করে রাখে কোন ইয়াহূদী, খ্রিস্টান বা এমন কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে যে তা থেকে মদ তৈরি করবে, তাহলে সে জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দিলো।[২১]

ফকীহগণের মতে মুসলিম দেশে অমুসলিমদের প্রকাশ্যে মদের ব্যবসার অনুমতি দেয়া এবং এর সুযোগ প্রদান করা জায়েজ নয়। (তবে মুসলিমপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০' এর ধারা ১০ অনুযায়ী আইনানুগ লাইসেন্স বা পারমিট থাকলে যে কেউ মদের ব্যবসা ও মদ পান করতে পারে)।

মিসরের মুফতী শায়খ আবদুল মজীদ সালীম র.-কে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি হবে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেমন- চেতনানাশক দ্রব্যাদির লেনদেন, চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয় অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা, উৎপাদন করা ইত্যাদি এবং এ ব্যবসা থেকে লব্ধ অর্থের অবস্থা কি?

মুফতী আবদুল মজীদ র. এর জবাবে বলেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, চেতনানাশক দ্রব্যাদির লেনদেন হারাম। কেননা এতে শারীরিক ক্ষতি এবং বহুবিধ

ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ সকল দ্রব্য জ্ঞান লোপ করে, শরীরের ক্ষতিসাধন করে। কাজেই শরীয়ত এসব দ্রব্যের লেনদেনের অনুমোদন দিতে পারে না। এছাড়া এগুলোর চেয়ে কম ক্ষতিকর বস্তুও হারাম। আর এ কারণেই কোন কোন হানাফী আলেম বলেন, যে ব্যক্তি ভাঙকে হালাল বলে সে ধর্মত্যাগী ও বিদআতী। চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম, এতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানীমূলক কাজে সহায়তা করা হয়। আর এ সহায়তা করাও হারাম। মাদক দ্রব্য তৈরীর উদ্দেশ্যে ভাঙ, আফিম ইত্যাদি উৎপাদন করাও সম্পূর্ণ হারাম আর এসব দ্রব্য থেকে লব্ধ অর্থও হারাম ও অবৈধ।[২২] হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন।[২৩]

মাদক নিয়ন্ত্রণে ইসলামী আইন

ইসলামী আইন সর্বকালের এবং সর্বশ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য ও কল্যাণকর। যারাই এই আইন প্রয়োগ করেছে তারাই এর সুফল পেয়েছে। কারণ এই আইনের উৎস স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন :

'হে মুমিনগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের প্রাণ সঞ্চার করে তখন তোমরা তার আহ্বানে সাড়া দিবে।'[২৪]

ইসলামী আইন মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, তাই এই আইনের অপর নাম 'জীবন'। আইন মেনে চলার দায়িত্ব মানুষের উপর বর্তায়। তাই ইসলাম মানুষকে আইন পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানবজাতিকে যুগপৎ পারলৌকিক কল্যাণ ও ইহলৌকিক কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। খারাব এবং ভালকে চিহ্নিত করে। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামী আইনের মূলমন্ত্র। ইসলামী আইনে কোন অসামঞ্জস্যতা নেই। ইসলাম কোন কিছুর অস্তিত্বকে বৈধতা দিয়ে কোন জটিল আইন প্রণয়ন করে তা নির্মূল করতে চেষ্টা করে না। মাদকের ক্ষেত্রেও ইসলামী আইনের ভূমিকা অনুরূপ। যা খারাব তা কখনও কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির জন্য অনুমোদনযোগ্য নয়, এমনকি লাইসেন্সের বলেও নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত দুষ্প্রবৃত্তির তাড়না তার দ্বিতীয় মাত্রা। তাই আল্লাহ বলেন :

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী'।[২৫]

ইসলাম মাদককে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। মাদককে ইহকাল ও পরকালের জন্য একটি ক্ষতিকর বস্তু হিসাবে উপস্থাপন করেছে। সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

'তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজে নিষেধ করবে'।[২৬]

'মন্দকে প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট (জিনিস) দিয়ে'।[২৭]
এমনকি পারিবারিক গণ্ডিতে ইসলামী আইন মেনে চলার তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। কুরআনে বলা হয়েছে:
'হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও'।[২৮]
ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ প্রবণতা একটি মনো-দৈহিক রোগ। আর রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিষেধকই উত্তম। তাই ইসলামী সমাজ অপরাধ সংঘটনের পরেই কেবল তার প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয় না, বরং অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে সে আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়। এই উদ্দেশ্যে সে মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে তাদেরকে সচেতন করে তোলে। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবার গঠনের পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষাকে ইসলাম বড় করে দেখে। পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা যুবসমাজকে মাদক গ্রহণে উৎসাহিত করে; উপরেই তা আলোচনা করা হয়েছে। কতগুলো পরিবার নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই পরিবার যাদেরকে মাদক থেকে ফিরাতে পারেনি রাষ্ট্রই তাদের প্রতিরোধের দায়িত্ব নেয়। অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস করাই ইসলামী আইন প্রয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য। কেননা ইসলামী আইনসমূহ পরস্পর আন্তসম্পর্কিত। ইসলাম একসঙ্গে সকল আইন পালন করতে নির্দেশ দেয় ও খণ্ডিত জীবনাদর্শ বর্জন করতে বলে। তাই ইসলামী আইনের সামষ্টিক অনুসরণ রাষ্ট্রে অপরাধীর সংখ্যা ও মাত্রা দু'ই হ্রাস করে এবং সার্বিক সুফল বয়ে আনে।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাদক সেবন একটি দণ্ডনীয় অপরাধ

(ক) মাদক দ্রব্য সেবন 'হারাম' এবং যে নেশাকর দ্রব্যের অধিক পরিমাণ পান করলে মাদকতা সৃষ্টি হয় তার সামান্য পরিমাণ পান করাও 'হারাম'।
(খ) মাদক দ্রব্য গ্রহণের শাস্তি সর্বোচ্চ '৮০ বেত্রাঘাত' এবং আদালত বিবেচনা করলে শাস্তির ধরন ও মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে।
(গ) মাদক দ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি, পরিবেশন ও উপঢৌকন প্রদান দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর শাস্তি আদালত নির্ধারণ করবে।[২৯]
পরিশেষে ইসলামী আইন অপরাধীর পরিবর্তে অপরাধের নির্মূল চায়। তাই ইসলামী আইনে একটি অপরাধ একই ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিতীয়বার সংঘটিত হয় না। ইসলামী আইন মানুষের মনে অপরাধের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে এবং সে সৃষ্টিকর্তার অনুগত হয় এবং বিপথগামিতা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ বলেন:

'...যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে জেনে শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না'।[৩০]

মাদকাসক্তদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি জানে, তাকে আল্লাহর নির্দেশে দণ্ডিত করা হচ্ছে। ফলে সে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সহজে চেষ্টা করে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সূরা মাইদা : ৯০
২. ১১ জানুয়ারী, ২০০৮, দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার উদ্বোধনকালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমীন, সাপ্তাহিক সোনারবাংলা, ১২ জানুয়ারী, ২০০৮, ঢাকা।
৩. ইংরেজী বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী।
৪. মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, ধারা-২।
৫. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর ধারা ৯ দ্রষ্টব্য।
৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, ধারা ১০ ও ১০ক।
৭. ইশতিয়াক আহমেদ ও হাসান মাহমুদ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধি ১৯৯০, নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, পৃষ্ঠা ২১৪।
৮. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, ধারা ১২
৯. ইশতিয়াক আহমেদ ও হাসান মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৩।
১০. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, ধারা ৪৮।
১১. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, ধারা ১৫।
১২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খন্ড, ধারা-১৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।
১৩.সূরা নিসাঃ ৪৩
১৪. সূরা বাকারা ঃ ২১৯
১৫. সূরা মায়িদা ঃ ৯০
১৬. Alcohol হলো এমন স্বচ্ছ তরল পদার্থ যা বিয়ার, মদ ইত্যাদীতে পাওয়া যায় অথবা ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় ও বিভিন্ন বস্তু পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।
১৭. আবু দাউদ সুলাইমান, সুনান আবু দাউদ, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবুল নাহই আনিলমুসকার, হাদীস ৩৬৮০।
১৮. প্রাগুক্ত, ৩৬৮২।
১৯. প্রাগুক্ত, ৩৬৮১
২০. প্রাগুক্ত, ৩৬৮৭

১৭. আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯৮
১৮. মুহাম্মদ শফীকুর ইসলাম গওহরী, মদ ও নেশাদ্রব্য প্রসঙ্গে ইসলামের বিধান, ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার, সংখ্যা ১৪, ২০০৮।
১৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৭৪, ইসলামে হালাল হারামের বিধান পৃষ্ঠা ১০৪।
২০. ইসলামে হালাল হারামের বিধান পৃষ্ঠা ১০৪।
২১. ফিক্হুস সুন্নাহ পৃষ্ঠা ৫৩৭।
২২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫৪০।
২৩. সূরা আনফাল:২৪।
২৪. সূরা ক্বাফ:১৬
২৫. সূরা ইমরান:১০৪
২৬. সূরা হামীম আস-সিজদাহ্:৩৪
২৭. সূরা তাহরীম:৬
২৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খন্ড, ধারা-১৭২-ক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
২৯. সূরা আলে-ইমরান:১৩৫
৩০. মো. আবু তালেব, মাদকাসক্তি ও মুক্তির পথ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০০৮ এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৭।

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

আইনগত সহায়তার জন্য দরখাস্ত আহ্বান

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ' এর লিগ্যাল এইড সেলের অধীনে দুঃস্থ অসহায়দের আইনী সহায়তা দেয়ার জন্য প্রকৃত মজলুম ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আইনী সহায়তা প্রার্থীকে দরখাস্তের সাথে তার বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘন ও জুলুমের বিস্তারিত বিবরণ তথ্য প্রমাণসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে পৌঁছাতে হবে। দরখাস্তে প্রার্থীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা:

সদস্য সচিব, লিগ্যাল এইড সেল
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
নোয়াখালী টাওয়ার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট-১৩বি
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০